শূন্য বৃক্ষ

রণজিৎ রায়

উদ্বোধন কার্যালয়
কলিকাতা

প্রকাশক
স্বামী সত্যব্রতানন্দ
উদ্বোধন কার্যালয়
১ উদ্বোধন লেন, বাগবাজার
কলিকাতা- ৭০০০০৩

প্রথম প্রকাশণ
উদ্বোধন বাড়ীতে শ্রীশ্রীমায়ের শুভ পদার্পণতিথি
১৭ জুন ১৯৬৪

বর্ণসংস্থাপক
শিক্ষা-সম্প্রসারণ নিয়ামক
২৪/এ, কলেজ রো, কলিকাতা-৭০০০০৯

মুদ্রক ঃ
রমা আর্ট প্রেস
৬/৩০ দমদম রোড, কলিকাতা- ৭০০০৩০

অগ্রজা
অনুজা
ও
আত্মজাদ্বয়কে

সূচিপত্র

সিঁড়ি

কামরূপ কামাখ্যার দেশ অসমের গুয়াহাটিতে আটাশদিন ট্রেনিং-এর কাগজটা হাতে পেয়ে সুজয় ক্ষোভে ফেটে পড়ে। জুনিয়র অফিসারেরাও যেখানে মহারাষ্ট্রের পুণেতে যাচ্ছে, সেখানে তাকে যেতে হচ্ছে গুয়াহাটিতে! বাকি তিনজন ট্রেনিং মেইটের অনুরোধে প্রতিবাদ জানিয়ে অবশেষে সে যেতে রাজি হয়। অসমের অবস্থা এখন একটু বেসামাল। স্পষ্ট করে বললে বলতে হয়, বাঙালীদের ওপর আক্রমণ হচ্ছে। রাজ্যের নামটা 'আসাম' থেকে 'অসম' ও রাজধানীর নামটা 'গৌহাটি' থেকে 'গুয়াহাটি' হয়েছে। ট্রেনিং সেন্টার ও হোস্টেলের বাইরে সাবধানে চলাফেরা করতে হবে। বন্ধুরা সুজয়কে নিয়ে ভাবেনা। সবসময়ে তার স্টার ফেভারে থাকে। বিপদে পড়েও সে বেঁচে যায়, দুঃখের মাঝেও সুখের ইঙ্গিত থাকে। সুজয় এসব মানে না। তার মূলমন্ত্র হচ্ছে তিনটি 'স' অর্থাৎ সততা, সত্যবাদিতা এবং সরলতা।

গুয়াহাটিতে পৌঁছে ওরা চারজন দিসপুর পূর্বাঞ্চল ব্যাঙ্কের ওপর মাল্টিস্টোরিড বাড়িটার সেকেন্ড ফ্লোরে রুম পেল। থাকা ও খাবার চমৎকার সুযোগ পেয়ে পুণের দুঃখটা ভুলে গেল। বিভিন্ন ব্যাঙ্ক থেকে তিরিশজন অফিসার এসেছে। সবাই ম্যানেজার। ট্রেনিং সেন্টারটি শীততাপ নিয়ন্ত্রিত। ট্রেনিং-এর সম্পূর্ণ ব্যয়ভার বহন করছে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া। পাঁচটায় বেড টি, আটটায় ব্রেকফাস্ট, একটায় লাঞ্চ, সাড়ে তিনটায় স্ন্যাক্স উইথ টি, পাঁচটায় আবার। রাত ন'টায় ডিনার। সকাল ন'টা থেকে পাঁচটা পর্যন্ত ট্রেনিং ক্লাস, এ সময়ের মধ্যে অনেকবার চা এর ব্যবস্থা আছে।

ট্রেনিং ক্লাসে বসে থাকা কষ্টসাধ্য, ঘুম চলে আসে। সবার সঙ্গে সুজয় আন্তরিকভাবে মিশেছে, অসমিয়া ছেলেদের তার খুব ভাল লাগে। সে ভেবে পায় না এরা বাঙালীদের ওপর বিরূপ কেন? শিবসাগর থেকে আসা ইউ বি আই-র সুরেন রাজকোয়ার সাথে বেশ কথা হল। সরল মনের ছেলে। সুজয়কে তারও পছন্দ। ব্রেকফাস্ট, লাঞ্চ ও ডিনারে ওরা একই টেবিলে পাশাপাশি বসে। সুজয় অসমিয়া ভাষা জানেনা। কিন্তু সুরেন ভাল বাংলা জানে।

ডিনারের পরেও ওদের দু'জনের গল্পের শেষ নেই। ব্যাঙ্কের অভিজ্ঞতা ও ব্যক্তিগত জীবনের অনেক কথা ওদের মধ্যে বিনিময় হয়। কিন্তু আজ সুরেনকে একটু অন্যরকম মনে হচ্ছে। সে যেন জোর করে হাসছে। তার মুখটা ফ্যাকাসে। বুকের ভেতর থেকে যেন ঠেলে কান্না বেরিয়ে আসতে চাইছে এবং তা চাপা দিয়ে সুজয়ের সাথে তাল মিলিয়ে সময় কাটাচ্ছে। সুজয়ের কাছে তা লুকিয়ে মনে মনে কষ্টও পাচ্ছে খুব। সুজয় বুঝতে পারে তার কষ্টের অবস্থাটা। কিন্তু কী ঘটনা নিয়ে কষ্ট পাচ্ছে, সুজয় তা জানবে কী করে? সে উঠে অন্যমনস্ক

সুরেনের কাঁধে আলতোভাবে হাত রেখে চোখে চোখ রাখে। সুরেন চোখটা নামিয়ে একটা বড় নিঃশ্বাস ফেলে।

সুজয় ধীরে ধীরে বলে, 'তোর কষ্ট হচ্ছে দেখে আমার ভাল লাগছে না। কারণটা যত কষ্টেরই হোক আমি শুনতে চাই। কষ্ট শেয়ার করা সম্ভব না হলেও অন্তরঙ্গ মানুষের কাছে প্রকাশ করে হাল্কা অনুভব করা যায়।'

সুরেন অবাক হয়ে যায়। সাতদিনের পরিচিত বন্ধুর আন্তরিকতায় সে অবাক হয়ে ভাবে, বাঙালীদের তাদের সমাজে যে চোখে দেখে এ ছেলেটিকে দেখে প্রথমদিন থেকে ধূর্ত, স্বার্থপর ইত্যাদি কিছুই মনে হয় নি। তাকে এত আপনজন মনে হচ্ছে যে সুজয় সেনের জন্যে সে সব কিছু করতে পারে। তার ইচ্ছে হচ্ছে তার কাঁধে মাথা রেখে চীৎকার করে কেঁদে তার গোপন কষ্টটা ঝেড়ে ফেলে দিতে । কিন্তু বাস্তবে তা সম্ভব নয়। এত গোপন কথা আপনজনের কাছেও বলা যায় না। কিছু বলতে গিয়েও তার মুখ থেকে শব্দ বেরোয়নি। সুজয় সুরেনের কাঁধে আবার হাতটা রেখে বলে, 'তুই ভরসা করতে পারিস, ভয় নেই বন্ধু।'

সুরেন তার দিকে নিষ্পলক চেয়ে থাকে। হয়ত শেষবারের মত সুজয়ের মুখে নিশ্চয়তা আছে কিনা দেখে। সুজয় তার পিঠে হাত বুলিয়ে ভরসা দেয়। সুরেনের চোখে জল গড়িয়ে পড়ে। কান্নার আবেগটা একটু কমে এলে সে শুরু করে। 'প্রায় পাঁচ বছর আগের ঘটনা। বাড়ি থেকে আমার পোষ্টিং অনেক দূর। তখনও বিয়ে হয়নি আমার। ছোট বোন নীলার বিয়ে আগে হবে। আমি মাসে একবার বাড়ি আসি। টেলিফোনে প্রায়ই কথা হত। নীলা অসমিয়া ভাষা নিয়ে পি. এইচ. ডি করছে। একমাত্র বোন। আমাদের সবার আদরের। ছোট দু'ভাই বাইরে পড়াশোনা করে । বাবা রিটায়ার্ড একাউন্টস্ অফিসার। মা প্রেসারের রোগী। হঠাৎ টেলিফোনে খবর পেলাম আগের রাতে বাড়িতে ডাকাতি হয়েছে। বাবা ও নীলা হাসপাতালে। আমি বাড়িতে ফিরে আসি। ডাকাতরা বেশী কিছু নেয়নি। কিন্তু আমাদের পরিবারটা শেষ হয়ে গেল।'

সুরেন কান্নায় ভেঙে পড়ে। ঠিক বুঝতে না পেরে জিজ্ঞেস করলাম, 'বাবা ও নীলা সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরে এসেছে ?'

সুরেন যন্ত্রণায় কুঁকড়ে উঠে বলে, 'ফিরে এসেছে। নীলার শরীরটা সুস্থ হলেও মনটা অসুস্থই রয়ে গেল। পড়াশোনা আর হল না। বিয়ে দেয়া যাচ্ছে না। পুরুষকে সে ঘৃণা করে। সেই রাতের বিভীষিকা সে মন থেকে মুছে ফেলতে পারছে না। বাবা আমার বিয়ে দিলেন। ভেবেছেন, বাড়িতে বৌ এলে হয়ত নীলা ঠিক হবে। কিন্তু নীলার কোন পরিবর্তন হয়নি।'

সুজয়ের মুখ দিয়ে কথা বেরুল না। সে অতটা নির্মম ঘটনা আশা করেনি। সে সুরেনকে তার রুমে দিয়ে আসে। তাকে শুইয়ে দিয়ে সে চলে আসে তার নিজের রুমে। পরদিন ভোরে সুরেনকে সুপ্রভাত জানাতে এলনা সুজয়। ব্রেকফাষ্ট একটু দেরী করে আসে। জোর করে হাসতে চেষ্টা করে সুরেনের পাশে বসে। কিছুই খেল না বলা যায়। দু'টি বড় সাগর কলা, বড়

ব্রেডের চারটি পীস্, দু'টো ডিম, বাটার, জেলি ও আলু মটরের গরম তরকারী সব পড়ে আছে ।

ট্রেনিং সেন্টারের গাড়িতে তাকে ডেকে আনতে হল। ক্লাসে একদম মন নেই। তার চোখে আজ তন্দ্রাও নেই। সুরেনের নিজেকে অপরাধী মনে হয়। লাঞ্চে কাছে বসে সুরেন তাকে ফাঁকে ফাঁকে সার্ভ করলো, কিন্তু সে খেতে পারল না। ডিনারে কিছুটা খেতে পারল। আজ আর বাইরে নয়, সুরেনকে তার রুমে নিয়ে এসে সুজয় দরজা জানালা সব বন্ধ করে দেয়। সুরেনের দিকে স্পষ্টভাবে দেখে সোজাসুজি প্রশ্ন করে, 'রাজকোয়া! তোর সঙ্গে আমার পরিচয় ও অন্তরঙ্গতা মাত্র এক সপ্তাহের। তুই আমাকে কতটুকু বিশ্বাস করিস ?'

একটুও চিন্তা না করে রাজকোয়া দৃঢ়তার সঙ্গে উত্তর দেয়, 'আমি তোকে আমার আপন ভাইয়ের চাইতেও বেশী বিশ্বাস করি। সুজয়, তুই আমাকে ভুল বুঝলে আমার দুঃখে ভারাক্রান্ত বুকটা ঝাঁঝরা হয়ে যাবে।'
সুজয় দৃঢ়তার সঙ্গে সমর্থন করে বলে ওঠে, 'আমি জানি বন্ধু, সেজন্যেই বোন নীলাকে নিয়ে পরীক্ষা করার সাহস পাচ্ছি। তোর স্ত্রী কাছে থাকলে আরো সুবিধা হত।'
দুই বন্ধুতে অনেক রাত পর্যন্ত কথা হয়। সুরেন কখনো সায় দেয়, কখনো চমকে ওঠে। কাল টেলিফোনে সুরেন নীলার সঙ্গে কথা বলবে। পরশুদিন নীলা যেন গুয়াহাটি আসে। দু'জনে এক মত হয়ে সিদ্ধান্ত নেয়। নীলার থাকার জায়গাটা নিয়ে দু'জনেই চিন্তিত। হোস্টেলে তো আর অতদিন রাখা যাবে না। হোস্টেলে একটা মেয়ে একা থাকাও সম্ভব নয়। সুরেনও হোস্টেলের বাইরে থাকার অনুমতি পাবে না। একটা মেয়ে একা থাকা কত কঠিন বিপদে পড়লে টের পাওয়া যায়। সুজয় অত ভাবছে না। প্রথম দিন সে হস্টেলের গেষ্টরুমে থাকতে পারবে। দু'জন মহিলা অফিসার ট্রেনি রয়েছে। ওদের সঙ্গেও এক দু'দিন থাকতে পারবে।

দূরভাষে পরদিন ভোরে সুরেন নীলার সঙ্গে কথা বলে। শুনে সে খুশিতে চীৎকার করে বলেছে, সে আসছেই। সে বলেছে সে দাদার সঙ্গে ফিরে আসবে। সুরেনকে একটু চিন্তিত মনে হয়। টেলিফোন বুথ থেকে ফিরে সুজয়ের রুমে ঢুকে বলে, 'আচ্ছা সুজয়, আমাদের পাশের হোস্টেলের ডানদিকের হোটেলটা খুব সুন্দর, পরিচ্ছন্ন। তার একটা সিঙ্গেল রুমে নীলা থাকতে পারে না? রাতে আমরা দিয়ে আসব। রুমেই টেলিফোন রয়েছে। কোন কারণেই রাতে দরজা খোলার প্রয়োজন নেই। কথা বলতে চাইলে টেলিফোনে আমাদের সাথে কথা বলতে পারবে।'
'কিন্তু রেন্ট তো অনেক বেশী হবে, রাজকোয়া।'
'রেন্ট বেশী হলেও নিরাপত্তা নিয়ে কোন প্রশ্ন নেই। আমরা গিয়ে কথা বলে একটা রফা করতে পারব। তুই টাকার জন্যে ভাবিস না। নীলাকে বলেছি, তার বৌদির কাছ থেকে টাকা নিয়ে আসতে ।'
আজ রবিবার। প্রথম ছুটির দিন পেয়ে সাতটা বেজে গেলেও অনেকের বেড টি নেওয়া হয়

নি। প্রাণ ভরে মুক্তির বাতাস টেনে নিচ্ছে। গতকালই অনেকে চলে গেছে শিলং-চেরাপুঞ্জি। কিন্তু সুজয় সুরেনের আজ ব্যস্ততার দিন। নীলা নাইট সুপারে আসছে । আটটার মধ্যেই গাড়ি ঢুকবে। ওরা দু'জন অপেক্ষা করছে । হোটেল ঠিক হয়েছে। টেলিফোন ছিল না। আজ এক্সটেনশন লাইন দেবে। ছয়শ টাকা ভাড়ার রুমে টেলিফোনের প্রশ্ন ওঠে না। অনেকদিন থাকবে, তাই বলে-কয়ে টেলিফোনের ব্যাপারটা হয়েছে। একটা ছোট ঘটনায় সুজয় সুরেনের পরিবারের স্ট্যাটাস কতটুকু বুঝতে পারে। সুরেন অভিজাত পরিবারের ছেলে। কিন্তু তাকে দেখে তা মনে হয় না। সুরেন বোনের জন্যে একটা ফুলের তোড়া নিয়ে আসে। সুজয়ের হাতে দিতে চেয়েছিল। সে নিষেধ করে।

নীলা নেমেই সুরেনকে জড়িয়ে ধরে। ফুলের তোড়াটা হাতে নিয়ে দাদাকে ধন্যবাদ দেয়। দূরে দাঁড়ানো সুজয়কে পরিচয় করিয়ে দেয় সুরেন। প্রতি নমস্কার করে নীলার মুখটা গম্ভীর হয়ে যায়। ফিস্‌ফিস্ করে দাদাকে জিজ্ঞাসা করে, 'সাতদিনেই তোর বন্ধু হয়ে গেল। তুইতো দেখছি মেয়েদেরও ছাড়িয়ে গেছিস, দাদা।'
সুরেন হেসে ওঠে। তারপর খুব আস্তে আস্তে বলে, 'পরিচয় হলেই চিনতে পারবি। তখন আমার কথা ভুলে ঐ বাঙালীদাদার কথাই বলবি ।'
'বাঙালী! আমাদের কথা বোঝে ? ত্রিপুরার বাঙালী নয়তো ?'
'সুজয় আগরতলা থেকে এসেছে। অসমীয়া বোঝে না। ইংরেজী, হিন্দী জানে ।'
নীলা খুশি হতে পারেনি। তার মুখে আর কথা নেই। সুজয়ের দিকে আর দেখছেও না। সুরেন সব বুঝতে পারে। সুজয়কে কাছে নিয়ে এসে নীলার লাগেজটা হাতে তুলে দিয়ে হোটেলে যেতে বলে। সে কিছুক্ষণের মধ্যে হোস্টেল থেকে ফিরে আসবে।

নীলাকে দেখে সুজয় ঘাবড়ে যায়। সুরেনের বোন এত সুন্দর হবে সে ভাবতেও পারে নি। তার সংকোচ বাড়ে। তার ওপর হোটেলে নিয়ে যাবার ভার দিয়ে দাদা চলে যাওয়ায় নীলাও অবাক হয়। সুজয় হোটেলে ঢুকে রুম সার্ভিসকে ডেকে সব ঠিক করে নেয়। টেলিফোনটা টেষ্ট করে দেখে। সুরেনের সাথে কথা বলে । সুরেন জানায় সে দু'ঘন্টা পড়ে আসবে। নীলা সুজয়ের উপস্থিতিতে শুয়ে গড়িয়ে নিচ্ছে। খুব ক্লান্ত। সুজয় ওর দিকে না তাকিয়ে ফুলের তোড়াটা ড্রেসিংটেবিলের একপাশে গুছিয়ে রাখতে রাখতে বলে, ক্যান আই টেল ওয়ান থিং নীলা ?
'আমি ভাল বাংলা জানি । আপনি বাংলাতেই বলতে পারেন ।'
'চমৎকার! তোমার তো অনেক গুণ বোন । কাজের কথা হচ্ছে, তুমি ড্রেসটা পাল্টে ফ্রেস হয়ে নাও। আমি খাবার আনছি ।'
নীলা কিছু বলার আগেই সুজয় চলে যায় দ্রুতবেগে। ফিরে এসে দেখে নীলা আজকের কাগজটা পড়ছে। নানা রকমের অনেক খাবার এনেছে সে। অবশ্য সবই ড্রাই খাবার। আরো কিছু জিনিষ এনেছে। কাগজের প্লেট, ডিস ইত্যাদি। প্লেটে খাবার সাজিয়ে দিয়ে সুজয়

দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে হোস্টেলে ফিরে আসে। সুরেনের সাথে কথা বলে তাকে নীলার কাছে পাঠিয়ে দেয়। সুরেন গিয়ে দেখে নীলা তখনো কাগজ পড়ছে। নয়টা বেজে গেলেও নীলার ব্রেকফাষ্ট হয়নি।

সুরেন কাগজটা টেনে নিয়ে তাড়া দেয়, খেয়ে নে। দুপুরের খাবার কখন খাবি?

নীলা এদিক ওদিক দেখে সুজয়কে দেখতে না পেয়ে অবাক! মনটা খারাপ হয়ে যায়। ক্ষোভ প্রকাশ করে বলে, 'আমি একা খাব নাকি ?'

'আমি হোস্টেলে খেয়েছি। তুই দেরি করছিস কেন?'

'উনি খাবেন না? তোমার বন্ধু?'

'ঠিক বলেছিস তো, সুজয় তো হস্টেলেও খায়নি কিছু। তুই বলিসনি খেতে ?'

'দাদা, তুই অতটা অভদ্র আমি জানতাম না। তুই ওর হাতে আমার লাগেজটা তুলে দিয়ে সরে পড়েছিস। উনি খাবার এনেছেন। খাবার জন্যে প্লেটে সাজিয়ে দিয়ে গেছেন। কেমন দূরদর্শী ভদ্রলোক মাথা ধরার টেবলেট, অয়েন্টমেন্ট এনে রেখেছেন। তুই কি উনাকে বেয়ারা পেয়েছিস? ধেৎ আমার নিজেকে ছোট মনে হচ্ছে।'

'তার মানে আমি অভদ্র, সুজয় ভদ্রলোক। একঘন্টার মধ্যে ওই দাদার প্রতি এত টান? হায় ভগবান! চব্বিশটি ঘন্টা গেলে আমার অবস্থাটা কী দাঁড়াবে, আমি ভাবতে পারছি না।'

'দাদা, তুই বাঙালীর চেয়েও ধূর্ত। বৌদি তোকে ঠিকই বলে।'

'বাঙালীদের নিয়ে এভাবে বললে সুজয় কী ভাববে ?'

'সব বাঙালী কি খারাপ? সব একসঙ্গে খারাপ হয় না। বাঙালীর বুদ্ধি বেশী বলেই বলা হয়। ওনার সামনে কি আর বলব? তোর তো আবার মুখে আটকায় না। বললেও উনি মনে করবেন, মনে হয় না। আমাকে হোস্টেলে নিয়ে যাবি কখন ?'

'বিকেলে। এখন সবাই টাস্ক নিয়ে ব্যস্ত। আগামীকাল একটা টেষ্ট হবে।'

'বিকেলে কী বলছিস? আমি এখন যাব। ভাল্লাগছেনা।

'আমি জানি তুই এখন যেতে চাইছিস কেন ? ডোন্ট মাইন্ড ডিয়ার সিস্টার। তুই সুজয়ের কাছে যেতে চাস। এন্ড আই এম্ হানড্রেড পারসেন্ট সিওর।'

নীলা সুরেনের দিকে একটা বালিশ টেনে এনে ছুঁড়ে মেরে বললো, 'দাদা, তুই এখানেও আমাকে জ্বালাচ্ছিস। হ্যাঁ, আমি উনার সঙ্গেই দেখা করতে যাব। পর তো নয়, উনিও দাদা !'

সুরেন ছোটবোনকে জড়িয়ে ধরে আদর করে। তার দু'চোখে জল গড়িয়ে পড়ে। দাদা কেন কাঁদছে নীলা বুঝতে পারে। কিন্তু সে কী করবে! সেই ভয়ঙ্কর রাতে চার দুর্বৃত্ত যেভাবে তাদের লালসা চরিতার্থ করেছে, তার দুঃস্বপ্ন সে কিছুতেই ভুলতে পারছে না। কোন পুরুষকে আর ভালবাসতে পারবে, তার মনে হয় না।

নীলা হোস্টেলে যাবার জন্যে তৈরী হতে হতে আচমকা জিজ্ঞেস করে, 'আচ্ছা দাদা, ওই দাদা কি বিয়ে করেছেন?'

'না, ওর বয়স আমার চেয়ে কম হবে। এখন সে নোট করছে। খুব ডিসটার্ব করবি না। বরং

বিকেলে তাকে নিয়ে ঘুরিস। গুয়াহাটিতে সে প্রথম এসেছে। কামাখ্যার কথা বলছিল। তুই তাকে নিয়ে সব দেখাবি।'

হঠাৎ টেলিফোনটা বেজে উঠল। সুরেন রিসিভারটা তুললে হোটেল ম্যানেজার বলে, 'নীলাম্বরী রাজকোয়া আছেন? উনাকে দিন।'

নীলা শুনছে, অপর প্রান্ত থেকে সুজয় বলছে, 'নীলা, সুরেনকে পাঠিয়ে দাও হোস্টেলে। তোমার লাঞ্চ দু'টোর সময় পৌঁছে যাবে। একটু দেরী করে দিতে বলেছি। তুমি শুয়ে থাক, তুমি টায়ার্ড। টানা একটা পর্যন্ত ঘুমোতে চেষ্টা কর। দু'টোতে লাঞ্চ সেরে তৈরী থেকো। আমি বা সুরেন গিয়ে তোমাকে নিয়ে বেরুবো।'

নীলা হাসিমুখে সম্মতি জানিয়ে বলে, 'ও কে দাদা। তুমিই এসো। ও কে !' সুরেন মিট মিট করে হাসছে। নীলাও হাসছে। তারপর চোখ বড় করে বলে, 'সত্যি দাদা, লোকটার ব্যক্তিত্ব আছে। নরম করে বললেও অমান্য করে কার সাধ্য। ঠিকই বলেছে, আমাকে ঘুমোতে হবে, আমি টায়ার্ড।'

সুরেন গম্ভীর হয়ে বলে, 'দু'ঘন্টাও শেষ হয় নি। চব্বিশ ঘন্টা পর আমার কী পরিণতি হবে ভাবছি। বাঙালী ছেলেরা সত্যি বিপজ্জনক, এখন আমি বুঝতে পারছি।'

নীলা ঠেলে দাদাকে বের করে দিতে দিতে বলে, 'ইস্ আর কত জ্বালাবি ? তোর না বন্ধু? ঠিক আছে এতদিনে তোর অভিভাবক পাওয়া গেল। আমি বৌদিকে আজই টেলিফোনে জানিয়ে দেব যে তোমার পূজ্যপাদ গুণধর স্বামীর একজন অভিভাবক পাওয়া গেছে। তিনি বয়সে ছোট হলেও তোমার গুণধরটি ভয়ে সদা সর্বদা তটস্থ থাকে।'

'সর্বনাশ এ কাজটি কিছুতেই করবি না। বৌটাও যদি ওর দিকে ঝুঁকে যায় আমার বৈরাগী হওয়া ছাড়া আর কোন পথ খোলা থাকবে না!'

'উনি তোর বৌ নিয়ে টানাটানি করতে যাবেন কেন? উনার জন্যে মেয়ের অভাব হবে নাকি দেশে? তাছাড়া উনি সেরকম লোকই নন।'

'আমার মনে হয় না কোন সুন্দরী মেয়ে স্বেচ্ছায় ওর দিকে ঝুঁকবে।'

'তুইতো মেয়েদের মনের বিশেষজ্ঞ। মেয়েরা তোর কাছে ছুটে আসবে তোর গবেষণার রসদ যোগাতে। তুই কী বুঝিস মেয়েদের মন? বিয়ের পর কাজে যোগ দিয়ে আটাশ দিন পরে বাড়ি এসেছিস। তা-ও বাবার, আমার চিঠির পর চিঠি পেয়ে। নতুন বৌটা যে তোকে ছেড়ে যায় নি, এটাই তোর কপালের ভাগ্য।'

'আর তুইতো ছেলেদের মনের বিশেষজ্ঞের বিশেষজ্ঞ, তাই না ?'

নীলার মুখের হাসি উড়ে গিয়ে মুখটা থমথমে হয়ে যায়। মাথা নিচু করে চোখের দৃষ্টি দাদার চোখ থেকে অন্যদিকে সরিয়ে নেয়। বুকের ভেতরের ক্ষতটা রক্তাক্ত হয়ে ওঠে। ধীরে ধীরে জ্বলতে থাকে।

সুরেন নিজের ভুল বুঝতে পারে। সে জানে শোধরানোর কোন পথ নেই। নীরবতাই এখন একমাত্র উপায়। চমৎকার রোদ ঝলমল দিনের আকাশে মেঘের ঘনঘটা দেখে সে খুশি হতে

পারে না। বাদলধারা নেমে আসবে কিনা, সঠিক অনুমান করতে ব্যর্থ হয়ে নীলাকে ঘুমুতে বলে সে হোস্টেলের পথে পা বাড়ায়। বৃষ্টি নামার আগেই সে ফিরে যেতে চায়। বর্ষাটা তার পছন্দের ঋতু নয়। সব অপছন্দের ব্যাপার তো হটিয়ে দেওয়া যায় না, মেনে নিয়ে জীবন যাপন করতে হয়।

সুরেন পালিয়ে এসে হাঁফাতে হাঁফাতে সুজয়ের কাছে সব খুলে বলে। সুজয় দেরী না করে হোস্টেলের রিসেপশন থেকে টেলিফোনে নীলার সঙ্গে কথা বলে সুরেনকে আশ্বস্ত করে, ভয় নেই বন্ধু। মেঘ কেটে গেছে। এবার আমাকে অব্যাহতি দিয়ে কৃতার্থ কর। আমার অনেক কাজ বাকি। তুইতো মহাকুড়ে, উপদেশ দিবি অথচ নিজে কিছু করবি না। বরং তুরা ব্রাঞ্চের ম্যানেজার খাসিয়া ম্যাডামের সঙ্গে আড্ডা দিয়ে আয়। স্ত্রী বিরহে দুধের সাধ ঘোলে মিটবে।'

'ডাইনীর মুখে ঠেলে দিতে হবে না, আমি সরে যাচ্ছি।'

'মাই গড! তোর বিশেষণের বিপজ্জনক ব্যবহারে আমি আশ্চর্য হচ্ছি। কোন সুন্দরী মেয়েকে, সে যত অপয়া হোক ডাইনী বলে মেরে ফেলতে শুনেছিস? খাসিয়া ম্যাডামকে উর্বশী, রম্ভা কিংবা পরী বলতে পারিস।'

'কিন্তু আমি হলফ করে বলতে পারি তোকে একা পেলে 'হার হাইনেস' গিলে ফেলবেই। এন্ড নাউ আই রিয়েলাইজ দ্যাট ইউ আর এভার রেডি টু স্যাক্রিফাইস।'

হো হো করে হেসে ওঠে সুজয় ও সুরেন। অন্য রুম থেকে ট্রেনিং মেইটরাও এসে সব শুনে হাসিতে ফেটে পড়ে। খাসিয়া ম্যাডামের রুমেও সেই হাসির শব্দ পৌঁছে যায়। নোট বন্ধ করে সুজয় উঠে পড়ে। সুরেন পালিয়ে যায়।

তিনটে বাজার কয়েক মিনিট আগে নীলা টেলিফোনে কথা বলে জানতে চায় হোস্টেলে সে আসবে কিনা। সুজয় হোস্টেলে আসতে নিষেধ করে কয়েক মিনিট অপেক্ষা করতে বলে। সুরেনের সঙ্গে কথা বলে সুজয় বেরিয়ে পড়ে।

দূর থেকে শাড়ি পরা নীলাকে দেখে সুজয় অবাক হয়ে যায়। ঠোঁটটা এমনিতেই লালচে, চোখগুলিও সুন্দর, শরীরটা দেখে মনে হয় রঙিন মোমের মতন। যে কোন পুরুষের বুকে মোচড় দেওয়া যৌবনের উপছে পড়া রূপ। এত সুন্দর বাংলা বলে যে আবাঙালী ভাবাটাই কষ্টসাধ্য। সহজভাবে মেলামেশা করাটা সুজয়ের পক্ষে কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। যেখানেই যাবে জোড়া জোড়া চোখ নীলার শরীরে নিবদ্ধ হবে। এ মেয়ে কারো রাজরাজেশ্বরী হয়ে সংসার আলোকিত না করে বাপের সংসারে পড়ে থাকবে - তা মেনে নিতে মা-বাবা-দাদাদের মনে অশান্তির ঝড় বইতে থাকবে, এতে আর আশ্চর্য কী?

নীলা সুজয়কে দেখে খুশি হয়ে ওঠে। কাছে এসে সুজয়ের একটা হাত টেনে নিয়ে বলে, 'দাদা তুমি সকালে আমার ভুলের ক্ষমা দাও। আমি বুঝতে পারিনি, তোমাকে অনেক কষ্ট দিয়েছি।'

সুজয় আকাশ থেকে পড়ে প্রশ্ন করে,'তুমিতো কোন ভুল করোনি। আমি ঠিক বুঝতে পারছি

না। তোমার ভুল হচ্ছে। সুরেনকে কিছু বলেছ কি ?'

'দাদা, তুমি অত বোঝ, আর আমার অহংকার, বাজে ব্যবহার, তাচ্ছিল্য তোমার চোখে পড়েনি এও আমাকে মেনে নিতে হবে ? তুমি ক্ষমা না করলে আমি এক পা-ও নড়ছি না।'

'ঠিক বলেছ, ক্ষমা করলাম। কিন্তু সাবধান করে দিচ্ছি, ভবিষ্যতে দাদার সঙ্গে অমন ব্যবহার করলে আর কথা না শুনলে কবরীতে শক্ত টান পড়বে।'

'দাদা, তোমার চমৎকার পোষাকে তোমাকে দারুণ স্মার্ট দেখাচ্ছে ।'

'নিশ্চয়ই! ব্যাংক ম্যানেজার, রিজার্ভ ব্যাংকের ট্রেনিং-এ এসেছি, স্মার্টলি চলতেই হবে। বুটের চকচকে উপরিভাগে নিজের ছবি দেখতেই হবে।'

'কিন্তু দাদা, তোমার মনটা বড্ড সেকেলে।'

সুজয়ের মনে হঠাৎ খটকা লাগে। নিজের অজান্তেই মুখের হাসি মিলিয়ে গিয়ে নীলার চোখে চোখ রাখে।

প্রশ্ন করার আগেই নীলা দুঃখ প্রকাশ করে বলে, 'একটি ঘন্টা ধরে অত সুন্দর করে সেজে এলাম, তুমি কমপ্লিমেন্ট দিলেনা। আমার আন্তরিক বিশ্বাস আমি ততটা কুরূপা নই। নয় থেকে নব্বই বছরের বালক থেকে বৃদ্ধ, পুরুষালি লোভাতুর দৃষ্টি নিক্ষেপ করবে, মেয়েরা ঈর্ষাতুর আড়চোখে দেখবে। তুমি ছাড়া প্রশংসা কে করবে দাদা?'

'খুব পাকামি হচ্ছে নীলা! কবরীতে তীক্ষ্ণ টান পড়বে। তবু বলছি একটা আর্টিকেলের অভাবে খুঁত রয়ে গেছে ।'

'খুঁত? কী সেই জিনিষটা?'

সুজয় ইঙ্গিতে নীলাকে অনুসরণ করতে বলে হোটেলের বিপরীত দিকের বিশাল চশমার দোকানে ঢুকে পড়ে। "লেডিজ সানগ্লাস, প্লিজ" বলে নীলাকে এগিয়ে দেয়। একটা পছন্দ করে চোখে লাগিয়ে সুজয়ের দিকে দেখতেই তার মুখ থেকে ফস্ করে বেরিয়ে পড়ে "এক্সিলেন্ট!" নীলাকে কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে সাড়ে তিনশ টাকা দাম মিটিয়ে সুজয় বেরিয়ে আসে।

নীলাও বেরিয়ে সুজয়ের সামনে দৌড়ে এসে দাঁড়ায়। চোখে মিনতি প্রকাশ করে বলে, 'দাদা, তুমি আগে কথাগুলো শোন, পরে মন্তব্য করবে।

এক ঃ আমি তোমাকে জব্দ করতে চেয়েছিলাম। কিন্তু তুমি কবরীতে তীক্ষ্ণ টান নয়, আমার কানটা মলে দিয়েছ।

দুই ঃ আমি চল্লিশ হাজার টাকার ট্রেভেলার্স চেক এনেছি। ক্যাস টাকা রয়েছে প্রায় আট হাজার। দাদারা-বৌদি-বাবা আমাকে যা দেন সব জমা থাকে। টাকা খরচ করতে না পারলে সুখ কোথায়। এবার থেকে পেমেন্টের সব দায়িত্ব আমার।

তিন ঃ আমি আজ প্রাগ্‌জ্যোতিষে সিনেমা দেখব। তুমি নিষেধ করতে পারবে না।'

সুজয় আর্তনাদ করে ওঠে, 'প্রাগ্‌জ্যোতিষ সিনেমা হল - সে তো অনেক দূর, নীলা? তোমার

সব মেনে নিলাম কিন্তু সিনেমার ব্যাপারটা আজ বাদ দাও। ফিরতে প্রায় রাত দশটা বেজে যাবে। লক্ষ্মীটি, অবুঝের মত জেদ করো না।'

'আমি যাবই। তুমি টেলিফোনে বড়দাকে জানিয়ে দাও। তোমার জন্যে গেইট খোলা রাখতে। হোটেলে আমার সমস্যা নেই। আমার রুমে দুটো বেড, ইচ্ছে করলে তুমি হোটেলেই রাতটা থাকতে পার। নচেৎ কাল আমি বাড়ি ফিরে যাব। আর একটা কথা তুমি গম্ভীর হয়ে থাকতে পারবে না। হাসিমুখে আমার সঙ্গে থাকবে। তুমি পুরুষ মানুষ। তোমার সমস্যা তুমি হাসি মুখে সমাধান করবে।'

শব্দ না করে মুখ টিপে হাসতে হাসতে সুজয়ের চোখ নাক ফুলে উঠেছে, সানগ্লাস থাকাতে নীলার চোখ স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে না। তবে ঠোঁটে হাসির রেখা ফুটে ওঠে।

গুয়াহাটির মার্কেটগুলি ঘুরে ওরা ঠিক পাঁচটায় প্রাগ্‌জ্যোতিষ সিনেমা হলের সামনে এসে পৌঁছয়। রাজেশ-হেমার "মেহবুবা"। সুপার হিট ছবি। 'রয়েল ড্রেস সার্কেলে'র দুটো টিকেট নিয়ে টেলিফোন বুথ থেকে সুজয় সুরেনের সঙ্গে কথা বলে।

নীলা সুজয়ের কী একটা কথায় হেসে গড়িয়ে পড়ছে, হঠাৎ ট্রেনিংমেইট বিপুল হাজারিকা যেন আকাশ ফুঁড়ে বেরিয়ে এসে নীলার আপাদমস্তক লক্ষ্য করে বলে, 'হ্যালো মিস্টার সেন। হল থেকে বেরিয়েছেন না ঢুকবেন?'

'ছবি দেখব। নীলা, আমার ট্রেনিংমেইট মিস্টার হাজারিকা। আমার বোন নীলাম্বরী রাজকোয়া।'

'রাজকোয়া' শুনে হাজারিকার দু'হাত ও চোখ যুগপৎ কপালে ওঠে। কিন্তু মার্জিত স্বভাবের হাজারিকা অধিক প্রশ্ন করে কৌতূহল প্রকাশ করে না। নীলার সঙ্গে দুয়েকটি কথা বলে সে সরে যায়।

নীলা বিরক্তি প্রকাশ করে বলে, 'এ আপদ আবার কোত্থেকে জুটল?'

'কী বলছ নীলা! এত সুন্দর হ্যান্ডসাম ছেলে বিপুল হাজারিকাকে তুমি আপদ বলছ? সে অত্যন্ত ভদ্র ও মার্জিত। আমার বোন থাকলে ওকে প্রপোজ করতাম।'

নীলা সুজয়ের বুকের কাছে দাঁড়িয়ে প্রাগ্‌জ্যোতিষ সিনেমা হলটা দেখছিল। সুজয়ের অমন কথায় তীব্র গতিতে ঘাড় ঘোরাতেই উড়ন্ত বেণীটা সুজয়ের বুকে আঘাত করে। চোখ বড় করে ধমকে ওঠে, 'তুমিও দেখছি বড়দার মত আমার পেছনে লাগছ। সঙ্গে থাকা কোন যুবতী মেয়ের কাছে অন্য যুবকের প্রশংসা করতে নেই। মেয়েদের মন পলকে পাল্টায়।'

'কথাটা ঠিক নয়। আমি তো দেখছি এই ডায়নামিক যুগেও অনেক মেয়ের মন গতিশীল না হয়ে জড় পদার্থের মত স্থির হয়ে আছে।'

নীলা সুজয়ের চোখের ও মনের ভাষা বুঝতে চেষ্টা করে। মুখে কিছু বলে না। তারপর ধীরে ধীরে সুজয়কে নিয়ে হলে ঢোকে। 'মেহেবুবা' দেখতে দেখতে মনে হয় রাজেশ খান্না জাত অভিনেতা। সে তুলনায় হেমামালিনী শিশু। গানের ক্লাসিক্যাল সুরে মনটা নাড়া দিয়ে ওঠে। ইন্টারভেলে হাজারিকা এসে মিলিত হয়। দাঁড়িয়ে হাল্কা টিফিনের পর নীলা সুজয়কে তাম্বুল

খেতে জোর করে। সুজয় কিছুতেই রাজী হয় না। হাজারিকা সমর্থন করে বলে, 'জোর করে দেবেন না মিস সেন।'
বিরক্তি প্রকাশ করে নীলা বলে, 'সরি মিস্টার হাজারিকা। আমার নাম নীলাম্বরী রাজকোয়া।'
'এক্সট্রিমলি সরি মিস নীলাম্বরী। মিস্টার সুজয় সেনের বোনকে রাজকোয়া বলতে ভুল হচ্ছে।'

তীব্র জেদ প্রকাশ করতে না পেরে নীলা সুজয়কে তাম্বুল খেতে বাধ্য করে ও নিজেও খায়। ছবির বাকি অংশ শুরু হতেই সুজয়ের অবস্থা করুণ থেকে করুণতর হয়ে গেল। কপাল, গলা, মুখ অস্বাভাবিক ঘামে ভিজে গেছে। সুজয়ের মনে হচ্ছে হলটা ঘুরছে। পকেটের রুমাল নিয়ে ঘাম মুছতে মুছতে সীটের পেছনে মাথা এলিয়ে দেয় সুজয়। নীলা ঘাবড়ে গিয়ে সুজয়ের মাথাটা কোলে নিয়ে ব্যাগ থেকে ছোট্ট তোয়ালে বের করে নাক মুখ কপালের ঘাম মুছতে থাকে। দূর থেকে হাজারিকা দৌড়ে এসে ফিসফিস করে নীলাকে বুকের বোতাম খুঁলে দিয়ে গলা ঘাড়ের ঘাম মুছে দিতে বলে দ্রুত বেরিয়ে গেল। ফিরে এসে নীলাম্বরীর হাতে একটা ক্যাডবেরিজ চকোলেট দিয়ে জোর করে খাইয়ে দিতে বলে সে তার সীটে ফিরে যায়। চকোলেট খাওয়ার মিনিট তিনেকের মধ্যেই সুজয় ঠিক হয়ে বসে। হাসিমুখে বলে, 'নীলা, তোমাকে সত্যি এম্‌বেরাস্‌ পজিশানে ফেলে দিলাম।'

নীলা ঠোঁট বেঁকিয়ে বলে, 'তাম্বুল খেয়ে কোন বীরপুরুষের এমন হতে পারে শুনিনি। আপদটার উপর জেদ করে আমি খাইয়েছিলাম দাদা, আমায় ক্ষমা করো, আর কখনও জোর করব না। তবে আপদটার খুব বুদ্ধি আছে। রিয়েলি, মেন্টালিটি ইজ ভেরি হেল্পিং।'
'ফর ইউ, নট ফর মি।'
'দাদা! তুমি বেশ বাড়াবাড়ি করছ। আমি জানি বড়দা তোমাকে শিখিয়ে দিয়েছে সব। তুমি সেভাবে চলছ, যাতে তোমাকে নিয়ে আর না বেরুই। আমি তোমাকে নিয়েই বেরুব।'

ওরা তিনজন একসঙ্গেই ফিরে আসে। কিন্তু হোস্টেলে ফিরতে সুজয়ের আরো চল্লিশ মিনিটের মত দেরী হল। নীলার রাতের খাওয়া শেষের পর সুজয় হোস্টেলে ফিরে আসে। সুরেন অপেক্ষা করছে। ঢেকে রাখা খাবার খেতে খেতে ওদের মধ্যে অনেক কথা হয়।

একটা ব্যাপার সুরেনের বড় অদ্ভুত লাগছে, সুজয় কিছু একটা সুরেনের কাছে লুকোচ্ছে। সেও মুখ ফুটে জিজ্ঞেস করবে না। বিপুল হাজারিকার রুমে সুজয়ের যাতায়াত বেড়ে যায়। ওদের মধ্যে নিভৃতে প্রায়ই কথা হয়। অবসর সময়ে হাজারিকাকে হোস্টেলে দেখা যায় না। নীলার মনটা পাল্টে যাচ্ছে। সুজয়ের কাছে সত্যিই সে কৃতজ্ঞ। তবুও এক অজানা আশঙ্কায় তার বুকটা কেঁপে ওঠে। অনেক ভেবেও সুজয়কে অবিশ্বাস করতে পারছে না। কিন্তু নীলাকে হোস্টেলে ঢুকতে নিষেধ করছে কেন সুজয়? নীলাও জোর করছে না কেন? এ পরিস্থিতিতে যার কাছে মনের কথা বলতে পারত, তার চালচলনকেই সে সন্দেহ করছে।

সুরেন আর ভেবে কষ্ট পেতে চায় না। যা হবার হবে। সুজয়কে অবিশ্বাস করার কথা সে আর ভাববে না, নচেৎ অবিচার হবে, অন্যায় হবে।

হোটেলের সামনে ট্যাক্সি থেকে নেমেই অপেক্ষারত সুসজ্জিতা নীলার হাতে সুজয়ের দেওয়া ছোট্ট চিঠিটা তুলে দিয়ে হাজারিকা চুরি করে তার রূপ-সুধা পান করছিল। পড়া শেষ করে নীলা হাজারিকার লম্বা হালকা শরীরটার প্রতি একবার চোখ বুলিয়ে নেয়। নীলার চাউনিতে শান্ত হাজারিকা ভয়ে চুপসে যায়।

কামাখ্যার সামনে অপেক্ষমান সুজয়কে দেখে নীলার মনটা খুশিতে ভরে ওঠে। ট্যাক্সি থেকে নেমেই দৌড়ে গিয়ে সুজয়ের গা ঘেঁষে দাঁড়ায়। সুজয় জানতে চায়, 'ওকে ধন্যবাদ দিয়েছ ? সে কিন্তু ক্লাস মিস করে কাজটা করেছে ।'

'হি ডিড ইট ফর ইউ বাট নট ফর মি।'

সুজয়ের মুখে হাসি। বুদ্ধিমতী নীলা ওরই কথার প্রতিধ্বনি করে ওকে জব্দ করে।

মন্দিরে ঢোকার জন্যে নীলা লাইনে দাঁড়ায়। একপাশে দাঁড়িয়ে একটু দূরে সুজয় আর হাজারিকা কথা বলছে। ওরা মন্দিরে ঢুকবে না।

'ট্যাক্সিতে কী কথা হয়েছে ? কতটুকু এগোলে ?'

'কোন কথা হয় নি। সে গম্ভীর হয়ে অন্যদিকে তাকিয়ে ছিল। আমি ভয়ে বলিনি।'

'স্কাউড্রেল কোথাকার! তাহলে সরে পড়। আমার কী করার আছে ?'

'দাদা, আমি নীলাম্বরীকে না পেলে বাঁচব না। আমাকে কী করতে হবে বলে দিন। সে অন্য দিকে চেয়ে থাকলে আমি কথাটা শুরু করি কী করে?'

'শালা! তুমি আমার বোনের সঙ্গে কী ভাবে প্রেম করবে, আমি শিখিয়ে দেব? তুমি বলতে পারতে, দিনটা আজ বেশ ঝরঝরে / চমৎকার দিন / অনেকদিন পর আজকের দিনটা চমৎকার / কাচটা নামিয়ে দেব আরেকটু / ঠাণ্ডা বাতাসে কি আপনার কষ্ট হচ্ছে / আপনি ভাববেন না দাদা শীঘ্রই পৌঁছে যাবে / আপনার দাদা খুব ভাল ইত্যাদি কত রকমেই শুরু করা যেত ।তুমি ফিরে গিয়ে CAIIB পরীক্ষার জন্যে তৈরী হও। প্রেম করা তোমার কর্ম নয়, তুমি মরলে আমার কী করার আছে ?'

হাজারিকা সব হজম করে হাসিমুখে। বলে, 'দাদা, আমাদের অসমিয়া সমাজে ব্রাদার অফ ওয়াইফকে শালা বলে। হাজবেন্ড অফ সিস্টারকে নয়।'

কৃত্রিম রাগ প্রকাশ করে সুজয় বলে, 'কাজের কাজ ত কিছুই পার না, পাকামিতে হাত পাকাচ্ছ । বাঙালী সমাজের নিয়মানুসারে তোমাকে আমার হেল্প করার কথা নয়।'

'দোহাই দাদা। আপনার পায়ে পড়ি। আর পাকামি করব না।'

সুজয় নীলাকে হাজারিকার সঙ্গে ফিরে যেতে বলে এয়ারপোর্টের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়।

সন্ধ্যায় হোস্টেল থেকে কী মনে করে সুজয় নীলাকে দেখতে হোটেলে তার রুমে যায়। নীলা উত্তপ্ত হয়ে আছে সে জানবে কী করে ?

নীলা সুজয়কে আপ্যায়ন করে নিয়ে বসায়। ধীরে ধীরে সব জানালা বন্ধ করে দিয়ে সুজয়ের

চোখে তার রক্তাক্ত চোখ রেখে জিজ্ঞেস করে, 'দাদা ! তুমি আমাকে এড়িয়ে গিয়ে আপদটাকে এগিয়ে দিচ্ছ কেন ?'

'নীলা ভদ্রভাবে কথা বল! বিপুল হাজারিকা ব্যাংকের স্কেল-টু অফিসার, এম কম এল এল বি, সি এ আই আই বি পাশ, সুন্দর সুঠাম শরীর, ভদ্র মার্জিত শান্ত ব্যবহার, উন্নত বংশ, ধনীর একমাত্র পুত্র সন্তান। তার সম্পর্কে তুমি অমন কথা বলতে পার, ভাবতে পারছি না।'

সুজয়ের ধমকে নীলা চমকে ওঠে, সুজয়ের বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ে স্বর্ণলতার মত আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ফুঁপিয়ে কাঁদতে কাঁদতে বলতে থাকে, 'আমি তোমাকে ছাড়া বাঁচতে পারব না। পৃথিবীর আর কোন পুরুষকে আমি বিশ্বাস করি না। ওরা নারী খাদক। আমি তাদের ঘৃণা করি। আমাকে সরিয়ে দেওয়াই তোমার উদ্দেশ্য হলে, আমার ভেতরের ঘুমন্ত সিংহকে জাগ্রত করলে কেন? আমার মনের প্রান্তর আচমকা বন্যায় যে প্লাবিত হয়ে যাচ্ছে !'

সুজয় এমন আকস্মিক ঘটনার জন্য. মোটেই প্রস্তুত ছিলনা। অতি কষ্টে সামলে নীলাকে ছাড়িয়ে নিয়ে বসাতে চেষ্টা করে। কয়েক মুহূর্তের মধ্যে নীলা আবার ঝাঁপিয়ে পড়ে। সাপের ফণার মত বেণীটির উৎসে তীক্ষ্ণ টান দিয়ে মারতে উদ্যত হয়। বিস্ময়ে হতবাক হয়ে নীলা বিছানায় পড়ে কাঁদতে থাকে। সুন্দর কমনীয় শরীরটা কান্নার বিলাপে স্পন্দিত হয়।

সুজয় উঠে গিয়ে পরম মমতায় পিঠে হাত বুলিয়ে আদর করতে থাকে। কান্নার বেগ বেড়ে যায়। সুজয় জোর করে নিজের বুকে নীলার গুচ্ছ কবরীর মাথাটাকে টেনে কান্না থামিয়ে দেয়। এক সময় নীলা টের পায় দাদার চোখের জলে তার পিঠ ভিজে যাচ্ছে। সম্বিত ফিরে পেয়ে শাড়ীর আঁচল দিয়ে দাদার চোখ মুছিয়ে দেয়।

সুজয় উঠে দাঁড়িয়ে কিছু না বলেই ধীরে ধীরে বেরিয়ে যায়। নীলা বোঝে না দাদার কী দুঃখ। তবে কি দাদা তার নারীত্বের চরম অবমাননার কথা জেনে তাকে ঘৃণা করছে? না তা হতে পারে না। দাদা পৃথিবীর ব্যতিক্রমধর্মী পুরুষদের একজন। দাদা না এলে সে আর রুম থেকে বেরুবে না।

সুজয় হোস্টেলে ঢুকে সুরেনকে হোটেলে গিয়ে বাকি কয়দিন নীলার খোঁজ খবর নিতে বলে। হাজারিকার ঘরে গিয়ে তাকে সব খুলে বলে। তাদের মধ্যে অনেক কথা হয়। সুরেন তার কিছুই জানে না।

একদিন সন্ধ্যায় সুরেন হোটেল থেকে হস্টেলে ফিরে এসে সুজয়কে কোথাও খুঁজে পায়না। হাজারিকার রুমে দু'জনকে ফিস ফিস অন্তরঙ্গ আলাপরত অবস্থায় দেখে তার মাথায় রক্ত উঠে যায়। ডেকে নিজের রুমে নিয়ে আসে। নিজেকে অনেক চেষ্টা করেও সংযত করতে ব্যর্থ হয়ে তীব্রভাবে জিজ্ঞেস করে, 'নীলার কী হয়েছে সুজয় ? তুই যাস না কেন? সে কেবল কাঁদছে ।'

'তাকে একটু কাঁদতে দে। তুই ভাবিসনা, সব ঠিক হয়ে যাবে।'

'কী বলছিস তুই? নীলা আমার আদরের ছোট বোন। গত তিনদিন সে কোথাও বেরোয়নি। আমার হৃৎপিণ্ডটা ছিঁড়ে যাচ্ছে। তোর কোন ভ্রূক্ষেপ নেই !'

'নীলাতো আমার বোন নয়। আমার হৃৎপিণ্ডটা ছিঁড়ে যাচ্ছে কেন? তুই কি আমার ওপরে বিশ্বাস হারিয়েছিস? অসময়ে আমাকে তাতিয়ে দিয়ে ক্ষতি করলি।'

রুম থেকে বেরিয়ে টেলিফোনটা তুলে নিয়ে নীলার সঙ্গে কথা বলে। আগামীকাল তিনটের সময় শিলং রওনা হবে। নীলা যেন তৈরি থাকে। টেলিফোনটা রেখেই হাজারিকার রুমের দিকে গমনোদ্যত সুজয়ের সামনে গিয়ে সুরেন বলে, 'সরি সুজয়।'

'দ্যাটস্ ওকে, ডোন্ট মাইন্ড।'

ডিনারের সময় সুজয়কে কোথাও পাওয়া গেল না। হাজারিকা ডিনারে আছে। ফোন করে জেনেছে নীলার কাছে যায় নি। রাত দশটায় সুজয় হন্ত দন্ত হয়ে ফিরে আসে। তাকে খুব খুশি দেখা যাচ্ছে। সুরেন এখনও খায়নি শুনে বিরক্ত হয়। খাবার টেবিলে বসে খুব শান্তস্বরে সুরেন জিজ্ঞাসা করে, 'কোথায় গিয়েছিলে?'

'কো-অর্ডিনেটরের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম। কাল দু'টোর সময় বেরুতে হবে না? পারমিশনটাও নিতে হবে। যে কড়া লোক, নচেৎ ব্যাঙ্কে রিপোর্ট করে বারোটা বাজিয়ে দেবে। নীলা যাবে ত ?'

'নিশ্চয়ই যাবে। তুই একবার দেখা করে এলে পারতিস।'

সুজয় হাসিমুখে মাথা নেড়ে আশ্বস্ত করে। তারপর হাজারিকার রুমের দিকে এগিয়ে যায়। দরজা বন্ধ করে খুব কাছে গিয়ে নীচুস্বরে হাজারিকাকে জিজ্ঞেস করে, 'কী ভায়া, খবর কী? পজেটিভ তো? কোথাও বেরিয়েছিলে ?'

'খবর পজেটিভ। বেরুব কী? আপনার ভয়ে সে আতঙ্কিত। দাদা আসতে পারে, দাদা টেলিফোন করতে পারে।'

'বললে না কেন তোমার দাদা আমার পকেটে। এনি প্রগ্রেস ? ফিলসফিক্যাল ?'

'যথেষ্ট, আপনি ভাববেন না। মেঘ কেটে গেছে।'

'বাইওলজিক্যাল প্রগ্রেস?'

'না বলাই উচিত।'

'স্কাউড্রেল কোথাকার!'

'পরশু অর্থাৎ শনিবার দুপুরের পর স্কাউড্রেল বললে আমি বোনের ওপর বদলা নেব। সাবধান করে দিচ্ছি। অত বকা-ঝকার প্রতিশোধ নেব না?'

হাজারিকা লক্ষ্য করে সুজয় সেনের চোখ ছলছল করে ওঠে। সে একটা কভার ফাইল সুজয়ের দিকে এগিয়ে দেয়। সুজয় খুলে দেখে বিপুল হাজারিকার সই করা ব্ল্যাংক নন্ জুডিসিয়াল স্ট্যাম্প, সাদা কাগজ ইত্যাদি। নীচ থেকে বের করে একটা ডিক্লেরেশন দেখায়। বাম হাত দিয়ে মাথার চুলগুলি নেড়ে দিয়ে হাজারিকার হাতে ফেরত দেয়। কিন্তু হাজারিকা

জোব করে সুজয়ের হাতে ফিরিয়ে দিয়ে বলে, দাদা আপনার বোন নীলার পুরো দায়িত্ব আমার। কাল সে আমাকে প্রত্যাখ্যান করলে কিংবা আবার মানসিকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়লেও জীবনের শেষদিন পর্যন্ত অপেক্ষা করব। আপনার দেওয়া উপহার আমি চিরদিন মাথায় করে রাখব। নিশ্চিন্ত থাকুন, তাঁর অনাদর হবে না। আমার বিশ্বাস আমার মা-বাবা নীলাকে দেখে একমাত্র ছেলের পছন্দকে অমর্যাদা করবে না।

সুজয় মিনতি করে একটা কথা মনে করিয়ে দেয়, 'নীলা সুস্থ থাকলে, যত বাধা আসুক শনিবারে তোমাদের ম্যারেজ রেজিষ্ট্রেশান হবেই, তুমি আমাকে কথা দাও।'

'আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, নীলা ও আপনার সম্মতি পেলে যত বাধা আসুক শনিবারে রেজিষ্ট্রেশন হবেই।'

'আমার সম্মতি কাল তোমাকে জানিয়ে দেব।'

শহরের শেষ প্রান্তে জি এস রোডের ওপর অপেক্ষারত হাজারিকাকে দেখে সুজয় বলে ওঠে, 'আপদটা আবার কোত্থেকে এল? না, কথা বলার প্রয়োজন নেই।'

বাধা দিয়ে নীলা বলে ওঠে, 'তুলে নাও, হয়ত শিলং যাবে।'

সুজয় লক্ষ্য করেছে এতক্ষণ নীলা ছটফট করেছে আর বাইরে তাকাচ্ছিল। সুজয় হাজারিকাকে পেছনে দিয়ে ড্রাইভারের পাশে গিয়ে বসে বলল, আমার গরম লাগছে, পেছনে তিনজন বসা যাবে না।'

নীলার খোঁচা খেয়ে হাজারিকা ভদ্রতা করে বলে, 'মিষ্টার সেন, আমি সামনে বসব। আপনি কেন আবার উঠে গেলেন ?'

'আপনি আমাদের অতিথি। অতিথির অমর্যাদা হলে পাপ হয়। বাই-দি-বাই, আপনি আমাদের সঙ্গে আসুন না। একসঙ্গে এনজয় করা যাবে।'

'সে তো আমার সৌভাগ্য! তবে আমার একটা বিশেষ কাজ আছে।'

'শুনুন। হোটেলে উঠে আপনি নীলার কাছে কিছুক্ষণ থাকুন। আমার একজনের সঙ্গে দেখা করতে হবে। ফিরে এলেই আপনি যাবেন। তারপর রাতের শিলং শহরটা দেখব।'

'আমার আপত্তি নেই। তবে রাতে বেশি ঘোরাঘুরি করা উচিত হবে না।'

হোটেল আগেই ঠিক করা ছিল। দুটো রুম একসঙ্গে। মোট তিনটি বেড। ডবল বেডের রুমে ওরা ঢুকল। সিঙ্গেল বেডের রুমে নীলা। নীলা ইচ্ছে করলে ভেতরের দরজা খুলতে পারবে। কিন্তু ডবল বেডের রুম থেকে খোলা যাবে না।

হোটেলে ওদের দু'জনকে রেখে সুজয় বেরিয়ে আসছে। পেছনে দৌড়ে আসা হাজারিকাকে দেখে সুজয় ফিস ফিস করে বলল, 'সব মনে আছে ত? তোমার ভয় নেই। আমি গ্রাউন্ড ফ্লোরেই থাকব। যাও দেরি করো না।'

সুজয় হোটেলে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছে। তার বুকের ভেতরটা ঢিব ঢিব করছে। মনে আশঙ্কা থাকলেও অদম্য সাহসে তা চেপে রাখে। হৃৎস্পন্দন যেন দ্রুতগতিতে বেড়ে যেতে

লাগল। খুব সাবধানে পা টিপে টিপে রুমের সামনে গিয়ে দেখে দরজা বন্ধ। আলো নেই। আলতোভাবে ঠেলে দেখে ভেতর থেকে বন্ধ। সে চোরের মত সরে এসে অপেক্ষা করতে থাকে। প্রায় এক ঘন্টা পরে নীলা দরজা খুলে এদিক ওদিক দেখে নিশ্চিন্ত হয়ে গুন গুন করে গান গাইতে থাকে।

আরো কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে সুজয় জোরে নীলাকে ডাকতে ডাকতে রুমে এসে দেখে হাজারিকা ঘুমুচ্ছে। নীলা তার রুমে ড্রেসিং টেবিলের সামনে বসে চুল বাঁধছে ।

সুজয় হাসিমুখে বলে, 'কিছুক্ষণের মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়লেন?' হাজারিকা লজ্জা পেয়ে উঠে বসে। নীলা বলে ওঠে, 'তোমার আসতে দেরি হচ্ছে দেখে উনি ঘুমিয়ে পড়েছেন।'

সুজয় বিরক্তি প্রকাশ করে বলে 'আপনি কেমন লোক মশাই ? বোন যাতে বোর ফিল না করে সেজন্যে আপনাকে রেখে গেলাম। আর আপনি দিব্যি ঘুমুচ্ছেন? আপনার কী কাজ আছে, শেষ করে চলে আসুন।'

বাধা দিয়ে নীলা বলে ওঠে, 'উনি বোধহয় টায়ার্ড ফিল করছেন। রাতের বেলায় বেরুবার কী প্রয়োজন? সকালে বেরুলেই হবে?'

'না, তা হবে না। ভোর ছয়টায় রওনা হব। ক্লাশ করতে হবে না?'

হাজারিকা বেরিয়ে পড়ে। সুজয় পিছু পিছু আসে। সিঁড়িতে হাজারিকা হঠাৎ সুজয়ের পায়ে ধরে প্রণাম করে বলে, 'দাদা, আমি আপনার কাছে চিরকৃতজ্ঞ হয়ে রইলাম। নীলা সম্পূর্ণ সুস্থ। আপনি আর কিছু জানতে চাইবেন না।'

হাজারিকার কানের কাছে মুখ নিয়ে ফিস ফিস করে বলে, 'স্কাউড্রেল! আমার সম্মতি দিলাম। কাল রেজিস্ট্রেশন হচ্ছে ত?'

'আপনি সম্মতি না দিলেও আমাদের ফিরে তাকাবার সুযোগ নেই। এখনও আমি স্কাউড্রেল? অত মহান ব্যক্তিদের আত্মীয় হয়েও স্কাউড্রেল রয়ে গেলাম?'

রাত দশটার মধ্যেই শুয়ে পড়ল সবাই। সুজয়ের ঘুম আসছে না। আগামীকালের কথা কল্পনা করে সে ঘুমুতে পারছে না। অন্ধকারে রেডিয়ামের আলোকে সে ঘড়ি দেখে। একটা। হাজারিকা ছট্ফট্ করছে । উঠে ঢকঢক করে জল খেল। সুজয়ের খাটের কাছে পা টিপে টিপে আসতেই সে ইচ্ছে করে নাক ডাকতে শুরু করে। হাজারিকা গিয়ে ভেতরের দরজায় খুব আস্তে তিনটা টোকা দেয়। খুব আস্তে দরজা খোলার শব্দ হয়। আবার বন্ধ হয়ে যায়। মাথার কাছে রাখা পেন্সিল ব্যাটারীর টর্চ দিয়ে সুজয় দেখে, হাজারিকা তার বেডে নেই। লজ্জা - লজ্জা - লজ্জা !

গর্বে-খুশিতে-সাফল্যে সুজয়ের মন ভরে ওঠে। সুরেনের মুখটা মনে পড়ে।

নীলার কলকাকলিতে সুজয়ের ঘুম ভেঙে যায়। সুজয়ের গা ঘেঁষে বসে চোখ কপালে তুলে বলে, 'দাদা, তুমি কী ঘুম কাতুরে! কখন থেকে ডাকছি তোমাকে। ছটা বাজতে পনের মিনিট বাকি মাত্র।'

তড়াক করে লাফিয়ে উঠে বলে, 'ট্যাক্‌সি এসে গেছে হয়ত। আমি তৈরী হয়ে নিচ্ছি। তোমরা সব গুছিয়ে নেমে যাও। মিস্টার হাজারিকা আপনিও অত ভোরে স্নান করে ফেলেছেন? ভালই করেছেন। ক্লাসে গেলে স্নানের সময় পাওয়া যাবে না।' হাজারিকা সোজা ট্রেনিং ক্লাসে চলে যায়। সুজয় নীলাকে হোটেলে পৌঁছে দেয়। বেরিয়ে আসার সময় নীলার মাথা টেনে নিয়ে কপালে পরম মমতায় স্নেহ চুম্বন এঁকে দিয়ে বলে, ভাল থাকিস বোন। মেয়েদের জীবনে সমঝোতা করে চলতে হয়। হঠাৎ কিছু বুঝতে না পেরে নীলা দাদার বুকে মাথা রেখে জড়িয়ে ধরে বলে, 'আজ শনিবার, হাফ। বিকেলে আমি হোস্টেলে যাব।'
মাথা নেড়ে সম্মতি জানিয়ে সুজয় ক্লাসরুমে ঢুকে পড়ে। কোঅর্ডিনেটরের সঙ্গে দেখা করে ট্রেনিং সেন্টার থেকে বেরিয়ে পড়ে। সুরেনের সঙ্গে দেখা হয়েছে, কথা বলার সুযোগ হয়নি।

ঘড়িতে তখন এগারটা বেজে দশ। হাজারিকা ট্রেনিং সেন্টারে ঢুকে কোঅর্ডিনেটরের কাছে জানতে পারে সুজয় বারোটার ফ্লাইটে ফিরে যাচ্ছে। মা অসুস্থ। সুরেন, হাজারিকা, নীলাম্বরী ও ত্রিপুরার তিনজন সহকর্মী সুজয়ের চলে যাওয়ার খবরে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যায়। মা অসুস্থ হলে ওরা জানত। কোঅর্ডিনেটর সাহেব টেলিগ্রামের ফটোকপিটা এগিয়ে দেয়। নীলাম্বরী হাজারিকাকে সন্দেহের চোখে দেখে, হাজারিকা সুরেনকে এবং সুরেন বোনকে। হাজারিকা সিদ্ধান্ত নেয় এয়ারপোর্টে ছুটে যাবে। এখনও যথেষ্ট সময় আছে। তাছাড়া ফ্লাইট দেরী হতে পারে। বাতিলও হতে পারে।

এয়ারপোর্টে পৌঁছেই ওরা জানতে পারে, প্লেনটা ছাড়েনি। ভেতরে ঢুকে দেখে সবার শেষে সুজয় সেন সিঁড়ি দিয়ে উঠছে। নীলাম্বরীর চীৎকার অতদূর পৌঁছার কথা নয়। বাতাসে দাদার চুল উড়ছে। হাতে ছোট ব্রীফকেস। সিঁড়িটা নামিয়ে আনা হয়। নীলাম্বরী হাজারিকার বুকে মাথা ঠুকে ঠুকে বলতে থাকে, 'তুমি জানতে দাদা চলে যাবে। তুমিই দাদাকে সরিয়ে দিয়েছ, আমি জানি।'

সুরেন রাজকোয়া বিস্ফারিত চোখে এ দৃশ্য দেখে চমকে ওঠে। বিপুল হাজারিকার বুকে নীলাম্বরী! সে কি স্বপ্ন দেখছে? এগিয়ে গিয়ে হাজারিকার বুকে আছড়ে পড়া নীলার মাথায় সুরেন মমতার হাত বুলিয়ে দিতে থাকে।

অভিসারিকা

পাপড় তৈরীর কাজে ব্যস্ত কয়েকজন বেসামাল মেয়ের পাশ দিয়ে সিঁড়ি ভেঙে ওপরে উঠে বিনয়ের বুকের ধুকপুকানি বেড়ে যায়। সিঁড়ির শেষ প্রান্তে দু'দিকে দু'সারি ঘরের সামনে মেয়েরা বসে গল্প করছে। একে অপরের গায়ে হেসে গড়িয়ে পড়ছে না, অশ্লীল ইঙ্গিতও চোখে পড়েনি। মুখে চিবুকে প্রসাধনের আধিক্য নেই। কয়েক ডজন সুন্দর চোখ আগন্তুকদের দিকে সতর্কভাবে একবার করে চোখ বুলিয়ে নেয়। ওদের দুজনের পা থেকে মাথা পর্যন্ত হাসিমুখে তীক্ষ্ণভাবে দেখে নিয়ে আসন করে বসা বয়স্কা মহিলাটি চেয়ার থেকে পা দুটো নামিয়ে আবার পান চিবুতে থাকে। বিনয়ের গা ছমছম করে ওঠে। চঞ্চল বিনয়ের কাঁধে হাত রেখে সাহস যোগায়।

বিনয়ের দিকে আরেকবার দেখে বয়স্কা বলে ওঠে, 'এনাকে নতুন মনে হচ্ছে!'
'আমার ভাই। ব্যাংকের অফিসার। আগরতলা থেকে এসেছে। নিয়ে এলাম সাথে করে।'
'ভাইকে খুব ভাল জায়গায় নিয়ে এসেছেন।' তোয়াজ না ব্যঙ্গ অনুমান করা সহজ ব্যাপার নয়। চঞ্চল বেমালুম হজম করে হেসে বিনয়ের আত্মবিশ্বাস ফিরিয়ে আনতে চেষ্টা করে, 'মাসী তোকে স্বাগত জানিয়েছে।'
চঞ্চল মাসীর সঙ্গে ফিসফিস করে দরকারী কথা সেরে নেয়। বিনয়ের পিঠে আলতোভাবে হাত রেখে তাগাদা দেয়, 'দুদিক দেখে নিয়ে বল কোনটি তোর পছন্দ?'
এসব পল্লী সম্পর্কে যা শুনে এসেছে তার কোন মিল খুঁজে না পেয়ে বিনয় হতাশ বোধ করে। এদের দেখে মাসি-পিসি-বোনের মতই মনে হচ্ছে। কোন অনুষ্ঠান শুরুর আগে সেজে গুজে অপেক্ষারত মেয়েরা সার বেঁধে যেমন নিজেদের মধ্যে গল্প করে এরাও তেমনি। নিজের মনের ভেতরে এদের সম্পর্কে তিলে তিলে গড়ে ওঠা ছবির বিপরীত দৃশ্য তাকে অতৃপ্ত করে তোলে। তার করণীয় প্রস্তুতি কাজে না লাগায় সে অসুখী হয়।

চঞ্চলের তাড়ায় বিনয়ের অন্যমনস্কতা কেটে যায়। দুদিক দেখে একটি মেয়েকে দেখিয়ে দেয়। চঞ্চল খুশী হয়ে মাসীকে জানায়। মুহূর্তে তৎপরতা শুরু হয়ে যায়। চঞ্চল বিনয়ের কাঁধে পিঠে চাপড়ে ভরসা দিয়ে একটি মেয়েকে অনুসরণ করে চলে যায়। অন্য মেয়েটি বিনয়কে ইঙ্গিতে অনুসরণ করতে বলে। নির্দিষ্ট ঘরে ঢোকার মুহূর্তে পেছন ফিরে অতিথিকে না দেখে ফিরে এসে বিনয়ের হাত ধরে এক মধুর ভঙ্গিমায় ঠোঁট উল্টে নিয়ে যেতে থাকে। অনেকটা বরকে নবপরিণীতা কনের বৌদি কিংবা বান্ধবী বাসর ঘরে নিয়ে যাবার মত।

ঘরে ঢুকে বিনয় বিস্মিত হয়ে দেখে ড্রেসিং টেবিল, আলনা, ফিল্টার, এককোণে বড় স্টিলের

বেসিন এবং একটা সুন্দর বিছানা। আরও আশ্চর্য একটা ছেলের পড়ার শব্দ পাশের রুম থেকে ভেসে আসছে। এগিয়ে গিয়ে সামান্য ফাঁক থাকা জানালার একটা পাল্লা একটু ধাক্কা দিতেই মানিকতলা প্রধান সড়কের জনস্রোতেব কর্মব্যস্ততা চোখে পড়ে। প্রধান সড়কের পাশেই একটা দোতালা বাড়িতে বেআইনীভাবে এমন কাণ্ড চলতে পারে বিনয় কল্পনাও করেনি।

মেয়েটি ছুটে এসে হা হা করে ওঠে, 'একি করছেন ? জানালাটা বন্ধ করে দিন। সর্বনাশ হবে।' পেছন ফিরে ঘরের তীব্র আলোতে মেয়েটির সম্পূর্ণ নিরাবরণ শরীর দেখে বিনয়ের বুকের ভেতরটা কেঁপে ওঠে। রক্ত-মাংসের একটা মেয়ের নিরাবরণ দেহ তার এই প্রথম দেখা।

মেয়েটির সুন্দর দু'টি চোখে চোখ রেখে বিনয় অনুনয় করে বলে, 'আমার একটা কথা রাখবেন আপনি ?'

'কী বললেন ? আপনার মতলবটা কী শুনি ? ভবানী ভবনের লোক নন্ তো ? নিশ্চয়ই কোন কুমতলব রয়েছে আপনার। 'আপনি' সম্বোধন করার বদ উদ্দেশ্যটা কী ?'

'কুমতলব থাকলে কী করবেন ?'

মেয়েটি বিনয়কে টেনে নিয়ে দরজার ছিদ্র খুলে চোখ রাখতে বলে। ছিদ্র দিয়ে বিনয় দেখল দু'টি ষণ্ডা মার্কা লোক দৈত্যের মত শরীর নিয়ে মাসীর সঙ্গে মস্করা করছে।

'আরব্য রজনী'তে এমন ভয়ঙ্কর দৈত্যের কথা পড়েছে বিনয়। ভয়ে তার শরীরের রক্ত হিম হয়ে যায়।

বিনয় এবার আরও স্পষ্টভাবে জানতে চায়, ''আপনি' সম্বোধনে অপমানিত বোধ করছেন, না বদ উদ্দেশ্যের গন্ধ খুঁজে পেয়েছেন ? নাকি কথা রাখতে বলাতে বিরক্তি বোধ করছেন ? আর কেউ 'আপনি' সম্বোধন করেনি আমি মানতে পারছি না।'

'কোন ভদ্রলোক কিংবা বয়স্কলোক 'আপনি' সম্বোধন করেনি। একবার অষ্টম শ্রেণীতে পড়া একটা ছেলে এসে 'আপনি' সম্বোধন করেছিল।'

'এটা অন্যায়-অবিচার-অভদ্রতা। অমানবিকও বটে। প্রয়োজনের তাগিদে দুপক্ষই এখানে আসছে। একপক্ষ কষ্টার্জিত অর্থের বিনিময়ে দুর্লভ সান্নিধ্য-সুখ পাচ্ছে। অপর পক্ষ তার সব উজাড় করে বিষ টেনে নিয়ে মহামূল্য অর্থ পাচ্ছে। এখানে বড়-ছোট, প্রভু-ভৃত্য, গুরু-দাসী সম্পর্ক নয়। দুদিকের পাল্লাই সমান। সুতরাং এ সম্পর্ক বন্ধুত্বের। আমি 'তুমি' সম্বোধন করতে পারি একটা শর্তে, আমাকেও 'তুমি' সম্বোধন করতে হবে।'

'খুশি করাই আমার কাজ। তোমার শর্তে আমি রাজি। আর ত দেরী করা ঠিক হবে না !'

'আমি তোমার নাম, তোমার অতীত ও বর্তমান জানতে চাই।'

'হোয়াট ? বেরিয়ে যান, প্লীজ ! আর কখনও এ বাড়ি আসবেন না। দুঃসাহস তো আপনার কম নয় !'

'আপনাকে দুঃখ দেবার অভিপ্রায় আমার নেই। আমার একটা নেশা হচ্ছে অভিজ্ঞতা

সঞ্চয় করা। পরিচিতি না দিয়ে লেখার মাধ্যমে তা জনসাধারণের কাছে পৌঁছে দেয়া। অভিজ্ঞতা অর্জন না করে কিছু লেখাটা আমার কাছে মূর্খতা।'

বিনয়ের সামনে দাঁড়ানো নিরাবরণ দেহটির রাগে কেঁপে ওঠা অংশবিশেষ স্থির হতে থাকে। বিনয় কিছু টাকা অব্যবহৃত বিছানায় রেখে দরজা খুলে বেরিয়ে যেতে পা বাড়ায়।
পেছন থেকে বাধা দিয়ে মেয়েটা ঝাঁঝিয়ে ওঠে, 'ভাল চাকরী করেন, আপনার অনেক টাকা তাইনা ?'
'সৎভাবে উপার্জিত টাকা এ দুর্মূল্যের বাজারে পর্যাপ্ত নয়। ব্যাংকে কাজ করেও বাজে পথে অঢেল ওড়ানোর টাকা অন্তত আমার নেই।'

মেয়েটি এগিয়ে এসে টাকাগুলো তুলে নিয়ে বিনয়ের বুক পকেটে ঢুকিয়ে দেয়। ঘরের বাইরে এসে বিনয় স্বস্তি বোধ করে। নিষ্ফল উদ্যোগের অতৃপ্তি মুখে প্রতিফলিত হয়। চঞ্চল তার অপরাধবোধ আন্দাজ করে দমে যায়। রোমান্টিক অভিসারের আলোচনা করার আকাঙ্ক্ষা অন্তরেই থেকে যায়। বিনয়কে সন্ধ্যার আগেই 'থ্রি সি বাই ওয়ান' কিংবা 'থারটি বি'তে নাগের বাজারে ফিরে যেতে বলে চঞ্চল তার কাজে ফিরে যায়।

চোখে কালো চশমা একটা মেয়ে অনেকক্ষণ ধরে ওদের অনুসরণ করছে। চঞ্চলকে সন্দেহের কথাটা বিনয় বলেনি। উদ্দেশ্যহীনভাবে সরে পড়তে একটা বাসে উঠতেই কালো চশমা ওর হাতটা ধরে বাধা দেয়। বিনয় ক্রুদ্ধ হয়ে কিছু বলার আগেই কালো চশমা চোখ থেকে উঠে যায়।
বিস্ময়ে ফেটে পড়ে বিনয়, 'আপনি! তুমি!! এত তাড়াতাড়ি এলে কী করে?'
'তুমি কি কলকাতায় নতুন এসেছো? বাসের নম্বর বলে গেল যে!'
'এর আগেও একবার এসেছি। আমার কিছুই মনে থাকে না। 'থ্রি. সি. বাই ওয়ানে' গেলে ঘুমিয়ে গেলেও অসুবিধা নেই। 'থারটি বি'তে গেলে জেগে থাকতে হবে কখন নাগেরবাজার আসবে। তুমি চলে এলে কেন ?'
'তোমার নিষ্পাপ দুটি চোখ আর ধ্রুবতারার মত কথাগুলো আমার বুকের ভেতরটা তোলপাড় করতে থাকে। বলনি কেন তুমি নতুন এসেছো ? তোমার নামটা কি বিনয় ? আমার নাম দামো। তুমি কাগজে পড়ে থাকবে 'কলকাতা শহর তিলোত্তমা' । আসলে তা নয় ।এখানকার আকাশে-বাতাসে ভয়াভয় সঙ্গীতের মূর্ছিত সুরঝংকার। প্রতি মুহূর্তে সর্বনাশের হাতছানি। সে তোমার কেমন ভাই যে তোমাকে এমন পরিবেশে নিয়ে তুলল ?'
'এ্যাই দামো, তুমি গাইড কিংবা অভিভাবিকা নও যে আমাকে কীভাবে চলতে হবে, কোথায় চলতে হবে পরামর্শ দেবে বা ব্যক্তিগত সম্পর্কেও দখল দেবে!'
'আমি তোমাকে ভুল বুঝেছি, এটা হয়ত ঠিক। তুমি আজ অক্ষত ফিরে এসেছো এটাই যথেষ্ট।'

'অভিজ্ঞতা অর্জন করতে হলে ঝুঁকি নিতেই হয় ।'
'না তোমাকে এমন ঝুঁকি নিতে আমি আর দেব না। এসো আমি তোমার অনন্ত জিজ্ঞাসার ক্ষুধা মেটাবো । জানিনা এতে তোমার অভিজ্ঞতার ভাণ্ডার কতটা উন্নত হবে।'

দামোকে রহস্যময়ী মনে হলেও অবিশ্বাসী মনে হয় না বিনয়ের। দামোর জীবনের ছন্দ কাটে। মানিকতলার ওই বাড়ির সিঁড়ি না ভেঙে বিনয়কে সঙ্গ দেয়। কলকাতাটা চষে বেড়ায়। ভয়াভয় সঙ্গীতের সুর শোনাতে সাহায্য করে। কলকাতার তিলোত্তমা রূপের অন্তরালে কুৎসিৎ চেহারা ভাস্বর হয়ে ওঠে।

মানিকতলার ঐ বাড়ি সোনাগাছির মত প্রকাশ্য নয়। কয়েকজন মেয়ে-বৌ স্বেচ্ছায় তাদের দুঃসময়ে আসে। পেশাদারী নয়। দুঃসময় কেটে গেলে নাও আসতে পারে। আগন্তুক বাড়িতে ঢুকে সিঁড়িতে পা রাখার আগেই দোতলা থেকে ওদের চোখে পড়ে। কারও পরিচিত কেউ এলে সে সরে গিয়ে আত্মগোপন করে। পাপড় তৈরির কুটির শিল্পটি পুলিশ আর মেয়ে-বৌদের অভিভাবকের চোখে ধুলো দেবার জন্যে গড়ে উঠেছে। দৈবাৎ কেউ এলে মান রক্ষা হয়। ব্যক্তিগত জীবনের গোপনীয়তা কঠোরভাবে রক্ষিত হয়। আদিম দপ্তরের কাজ দশটা-পাঁচটা। সূর্য ডোবার সাথেই দপ্তর আলোকিত না হয়ে বন্ধ হয়ে যায়।

এ কয়দিনে মানিকতলার ওই বাড়িতে যাওয়াকে দামোর দুঃস্বপ্নের মত মনে হয়। বিনয় যেন কতকালের চেনা, নতুন অতিথি নয়। ওর নিষ্কলুষ সান্নিধ্য-সুখ তার অভিশপ্ত জীবনের সব কালিমা ধুয়ে মুছে দিয়েছে। পক্ষান্তরে তিক্ত অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের চাপে বিনয়ের পরিচ্ছন্ন মুখে রুক্ষতার সুস্পষ্ট ছবি ফুটে ওঠে।

দামোর প্রথম যৌবনের সোনালী অতীতটা বারবার হাতছানি দেয়। অনেকদিন পর উর্বর মাটির সংস্পর্শে হৃদয়ের রুক্ষগাছ সবুজ হয়ে ওঠে। মন চায় জোয়ার ভাটার গল্প শুনে উচ্ছল হতে। ময়দানের সবুজ ঘাস, গাছ, নদীর ঢেউ, নীল স্বচ্ছ আকাশ দামোর মনে রঙ ধরায়। বিনয়ের ফিরে যাবার দিন ঘনিয়ে আসে। বুকের ভেতরটা তোলপাড় হতে থাকে। ফিরে যাবার দিনটা ঠেলে দিয়ে ওর সঙ্গ-সুখটা দীর্ঘায়িত করতে চায় সে। শরীরের সংযোগ ছাড়াই শুধু সান্নিধ্যে ওর মন সুখে স্নাত হতে থাকে।

সেদিনও ঘুরে ঘুরে ক্লান্ত শরীরে পড়ন্ত বেলায় বড়বাজারে এসে বিনয়কে একটু দাঁড়াতে বলে দামো সন্ধ্যার অন্ধকারে ভীড়ের মধ্যে হারিয়ে যায়। একটা লোক বিনয়ের কাছে এসে মিনতি করে ওর সঙ্গে পাশের দোকানে যেতে বলে। সে ইতস্তত করে একটু অপেক্ষা করতে বলে। লোকটি নাটকীয় ঢঙে বলে, 'দামো ফিরে আসার আগেই আমি আপনার সঙ্গে একান্তে কিছু কথা বলতে চাই।'
'দামোকে আপনি চেনেন?'

'দামোকে এক সপ্তাহে আপনি কতটুকু চিনেছেন আমি জানি না। আমার চাইতে দামোকে কেউ বেশী চেনে না, এটুকু বলতে পারি।'
'এত জোর দিয়ে কীভাবে বলছেন ? আপনি কে ? দামোর সঙ্গে আপনার কী সম্পর্ক ?'
'দামো আমার স্ত্রী। আমার নাম মিহির গুপ্ত ।'
'দামো বিবাহিতা?'
'দামো শুধু বিবাহিতা নয়, দামোর একটি সন্তানও রয়েছে ।'
'আশ্চর্য ঘটনা ! সত্যি বলছেন তো?'
'এখানে দাঁড়িয়ে অত কথা বলা যাবে না। চলুন কিছুক্ষণের জন্যে, ভয় নেই। দামো হারিয়ে যাবে না।'

মিহির গুপ্তকে অনুসরণ করে বেশী দূর যেতে হল না। বিনয়কে অত্যন্ত ভদ্রভাবে বসতে দেয় মিহির। ছোট্ট ছোট্ট কথায় নিজের সাম্প্রতিক অতীতের কিছু তুলে ধরে। সে সব কথায় বিনয়ের ভেতরটা ভূমিকম্পের মত লণ্ডভণ্ড হতে থাকে। বিদ্যুৎস্পৃষ্ট মানুষের মত ভয়ে শিউরে ওঠে।
কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থশাস্ত্রের ছাত্র মিহির গুপ্ত। সাহিত্যের ছাত্রী দামিনী সেন। উত্তাল ছাত্র-রাজনীতির ঢেউয়ে দুজনে ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠে। পরিণামজ্ঞানহীন ঘনিষ্ঠতায় দামিনীর শরীরে নতুন আগন্তুকের চিহ্ন ফুটে ওঠে। দামিনী উত্তরবঙ্গের জোতদার বাবাব পরামর্শ উপেক্ষা করে মিহিরের কাছে পাকাপাকিভাবে চলে আসে। মিহির বিশ্বাসঘাতকতা না করে দামিনীকে বুকে আশ্রয় দিয়ে হিন্দুস্থান পার্কের বাড়ি থেকে বিতাড়িত হয়।

অনেক ঘাটের জল খেয়ে আপাতত এই 'সাহা ট্রেডিং এন্ড সন্স'-এ মাসিক দেড় হাজার টাকা বেতনের হিসেবরক্ষক। ওঁরা প্রতি শুক্রবার শ্রীরামপুরে ওঁদের ছাপাখানা দেখতে যান। পিকনিকের মেজাজে কাটিয়ে সন্ধ্যার পরে ফিরে আসেন। মিহির আজ এ সুযোগটা নেয়।

মধ্যমগ্রামের সস্তা ভাড়া বাড়ি থেকে দুজনে আজ বেরুবার সময় মিহির দামিনীকে পাঁচ নং বিড়ি'র অফিসে বড়বাজারে সন্ধ্যা ছ'টায় দেখা করতে বলে। মানিকতলার পাপড় তৈরীর কারখানা থেকে দামিনী আগে পৌঁছলে যেন কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে। মিহির বাসস্টপে ঘন্টাখানেক আগে থেকেই ওঁৎ পেতে ছিল।
বিস্ময়ের ঘোর কাটিয়ে বিনয় জানতে চায়, 'আমি কি উঠতে পারি ?'
'আপনাকে দরকারী কথাটাই বলা হয় নি। আপনি কি দামিনীকে ভালবাসেন ?'
'বলেন কি ? আমি দামিনীকে ভালবাসতে যাব কেন ?'
'কিন্তু দামিনী আপনাকে ভালবাসে। সে আপনাকে নিয়ে দিনের বেলাতেই শুধু কলকাতা শহরটা রঙিন প্রজাপতির মত উড়ে বেড়ায় না । স্বামীর বাহুতে আবদ্ধ থেকেও স্বপ্নরাজ্যে আপনাকে নিয়ে ঘুরে বেড়ায়। আপনার নাম জপতে থাকে।'

'আপনাকে আজ প্রথম দেখলাম। জানলাম অনেক কিছু। কিন্তু আপনার বুদ্ধিমত্তার প্রশংসা করতে পারছি না।'

'আপনার তির্যক ইঙ্গিতটা পরমাণু বোমার চাইতেও বিধ্বংসী। আপনার ভালবাসার দামো শুনে তৃপ্তি পেত সাজানো পাপড় ইন্ডাস্ট্রির অন্তরালে দশটা পাঁচটায় কিসের প্রসেসিং হয় আমি জানি। অর্থনীতির ছাত্র হয়েও অর্থকে জয় করতে গিয়ে আমি আজ পরাজিত সৈনিক। বুদ্ধিমতী দামিনী স্বামীকে নীলকণ্ঠ না বানিয়ে নিজেই নীলাম্বরী হয়ে নকল অভিসারে বেরিয়ে যায়।'

'দিন দিন নারীত্ব বিকিয়ে সান্নিধ্যের ভয়, ঈর্ষা?'

'আপনি নিতান্ত ছেলেমানুষ। যদি না বোকার অভিনয় করে থাকেন। পাহাড়ী অঞ্চলের মানুষদের মাথাটা একটু মোটাই থাকে। নারীত্ব না বলে সোজাসুজি বলুন। শরীর আর মন কি এক ? সেখানে তো মনের কোন কাজ নেই। মানিকতলার বাড়িতে মনটা ছিল অটুট অক্ষত নিষ্পাপ। আমাদের সংসার স্বাভাবিক গতিতে চলছিল। আপনার সান্নিধ্যে এসে দামিনী ভারসাম্য রক্ষা করতে পারছে না। আমাদের সংসার তছনছ হয়ে যাচ্ছে। এতবড় সর্বনাশ কেউ করেনি আমাদের। আমি সব হারিয়ে দামিনীকে বুকে তুলে নিয়েছি। এখন দামিনীকে হারিয়ে কী নিয়ে বেঁচে থাকব বলুন ?'

ক্ষিপ্রগতিতে প্রায় উড়ে এসে দামিনী স্বামীর মুখে হাত চাপা দিয়ে বলে, 'দোহাই তোমার! আর বলো না। ওর নিষ্পাপ শুভ্র-কোমল মন এই ভীষণ তীব্র চাপ সহ্য করতে পারবে না। ওর মনের ভারসাম্য হারিয়ে যেতে পারে। আমি চিরদিন তোমার, তোমাকে ছেড়ে কোথায় যাব ? ওকে চলে যেতে বল।'

দামিনী মিহিরকে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকে। মিহির পরম নির্ভরতায় পিঠে হাত বুলিয়ে দেয়।

বিনয় নীরবে উঠে বারবার ফিরে ফিরে দেখে চলে যেতে থাকে। নাগেরবাজার কীভাবে ফিরবে ? 'থ্রি. সি. বাই ওয়ান'-এ গেলে শেষ টার্মিনাস 'নাগেরবাজার'। আর 'থারটি বি' তে গেলে সতর্ক থেকে বার বার খোঁজ নিতে হবে। না, দামিনীর কান্না তখনও থামে নি।

ছোড়লোক

মধ্য বসন্তের এক নির্জন দুপুর। বিশাল বৈদ্যবাড়ির ভেতরটায় খাঁ খাঁ শূন্যতা। বহির্বাড়ির বৈঠকখানায় নিত্যদিনের মত প্রতীক্ষারত কয়েকজন সুযোগসন্ধানী মানুষ। যে যার স্বার্থপূরণ আর সমস্যা সমাধানে উৎকণ্ঠিত। গর্ভগৃহের বারান্দায় মণিকার কোমল ডান হাত ক্ষুদে ছাত্র নন্দুর হাতের ওপর স্লেটে ধীরে গতিশীল। বৈদ্যবাড়ির দীর্ঘদিনের বিশ্বস্ত পরিচারিকা মালতি। মালতির অপ্রত্যাশিত সুন্দর ছেলে এই নন্দু। পরিচারিকার সন্তান হয়েও নন্দুর চলাচল এ বাড়িতে অবাধ। চঞ্চল নন্দু আইবুড়ো মেয়ে মণিকার সখের ছাত্র। আদর দিয়ে কিছু শেখানোই ওর উদ্দেশ্য। বৈদ্যবাড়ির বয়স্কা মা ভিন দেশে যাওয়া ছেলের চিন্তায় উৎকণ্ঠিত। দুই কান সজাগ রেখে অপেক্ষারতা মা তন্দ্রাচ্ছন্ন। অনতিদূরে হঠাৎ বাঁশিতে করুণ সুর। মণিকার বুকের ভেতরের কোমল অংশে তোলপাড়। বাঁশির সুরঝংকারে গুমরায় করুণ বিলাপের মত। স্লেট পেন্সিলের ঘর্ষণে সাদা অক্ষরের সৃষ্টি ব্যাহত হয়। অস্থির মনের বেসামাল শরীরটা নিয়ে সুরের কেন্দ্রবিন্দুতে ছুটে যায় মণিকা।

দিদিমণির দীর্ঘ অনুপস্থিতিতে ক্ষুদে ছাত্র নন্দু প্রতীক্ষায় আকুল। ঘরের পেছনে একটা কোকিলের অবিরাম কুহু কুহু ডাক। অনুকরণে উত্যক্ত করতে তার মন আনচান। দুই ঘরের মাঝের গলিপথ ধরে প্রকাণ্ড জাম গাছটার নিচে গিয়ে দাঁড়ায় সে। অন্য ঘরের পেছনের দরজায় মালীবাড়ির ছেলে মধু বাঁশিতে মুখ রেখে সুরের ঢেউ তোলে বাড়িময়। মধু এই গ্রামের ছেলে হয়েও বৈদ্যবাড়ির স্থায়ী ভৃত্য। ষাঁড়ের মত জোর শরীরে। বিশ্বস্ত ও একান্ত বাধ্য। মণিকা দিদিমণিকে তার খুব ভাল লাগে। বাঁশি বাজানো তার নেশা। বাঁশের বাঁশির সুরে বাড়িটা যখন মুখরিত হয়, দিদিমণি ছুটে আসে। মধুর মুখোমুখি ঘনিষ্ঠ হয়ে বসে। মুখে ফোটে খুশীর আভা। মধুও জীবন-সংসার ভুলে বাঁশিতে আনে ভিন্ন ভিন্ন সুর। তন্ময় হয়ে শোনে মণিকা। মুখোমুখি বসে দিদিমণির একাগ্র দৃষ্টি বাঁশের বাঁশিতে, মধুর মুখে-চোখে, বুকে, সর্বশরীরে। চোরের মত পালিয়ে রুদ্ধশ্বাসে দৌড়ে ফিরে আসে নন্দু। সুবোধ ছাত্রের মত অক্ষর সৃষ্টিতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। দিদিমণির প্রকৃতি ছোট্ট নন্দুর অজানা নয়। বাঁশি শোনায় ব্যাঘাত ঘটলেই মেজাজ বিগড়ে যাবে। মাশুল দিতে হবে নন্দুকে। ভাঙো, কাঁদো, দুষ্টুমি করো, কোন ভয় নেই। কিন্তু মধুর সান্নিধ্যে বাঁশি শোনায় ব্যাঘাত ঘটলেই বিপদ। অবধারিত শাস্তি। অনেকক্ষণ পর ফিরে আসে দিদিমণি। দুচোখে গভীর পরিতৃপ্তি। মুখে মৃদু হাসি। ঘুম ঘুম চোখে চলে যাবার ইশারা।

বাড়িতে পা রাখে ত্রিপুরা ফেরত চিন্ময় সেনগুপ্ত। বৈদ্যবাড়ির অঢেল সম্পদের সর্বময় কর্তা।

নিরাশার ঝড়ে তার ভেতরটায় প্রবল আলোড়ন। প্রতিবেশী দেশের ত্রিপুরা রাজ্যের পরিবেশ এ দেশ থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। মুসলমানের ভয়ে হিন্দুরা দেশ ছেড়েছে। অথচ হিন্দু-মুসলমান সম্প্রীতি সেখানে অটুট। এদেশের পালিয়ে যাওয়া দলিতদের সেখানে রাজ চলছে, আর বর্ণহিন্দুরা সব হারিয়ে ওদের গোলামি করছে। নারীর ক্ষমতা বাড়াবার লক্ষ্যে অবিরাম সরকারী উদ্যোগ। নারীর কোমলতা দূর করে পুরুষালি হতে হবে। বৈরী তৎপরতায় রাজ্যের সর্বত্র যাতায়াত অসম্ভব, তবুও সরকার বৈরীদের জন্য ঢালছে অঢেল। মনে মনে কিছুতেই মানিয়ে নিতে পারেনা চিন্ময়। বাড়ির সীমানার ভেতর বাঁশির সুর! মস্তিষ্কের কোষে কোষে বয়ে যায় উষ্ণ রক্ত প্রবাহ। জমিদারী মেজাজ বেশিক্ষণ ধরে রাখার অক্ষমতায় ফেটে পড়ে।

সুরের উৎসে মধুকে পেয়ে সর্বাঙ্গে চালিয়ে দেয় নির্দয় প্রহার। শরীরের অন্ধি-সন্ধি ফুলে ঢোল। চিন্ময়কে মায়ের কঠোর ধমক, মৃদু ভর্ৎসনা। চিন্ময়ের শ্রান্ত শরীরের রক্তের উষ্ণতাও স্তিমিত। শেষে নির্মম সতর্কবাণী, 'এ বাড়ির ত্রিসীমানায় তোকে যেন আর না দেখি। জ্যান্ত পুড়ে ফেলব। ছোটলোক কোথাকার! এটা ভদ্রলোকের বাড়ি। তোদের মত ছোটলোকের নয়। মালীর ছেলে ভদ্রলোকের বাড়িতে থাকলেই ভদ্রলোক হয়না।'

মধু দুই ঘরের মাঝের সরু গলিপথে শায়িত। শরীরের নানা স্থানে রক্ত জমাট বেঁধে আছে। তবু একটুও কাঁদেনি। যন্ত্রণায় কুঁকড়ে ওঠেনি। দানা-পানিহীন ক্ষুধা-ক্লিষ্ট শরীর। মণিকা নিঃশব্দে আসে। এক হাতে খাবারের থালা। অন্য হাতে জলের ঘটি। তার সামনে রেখে এগিয়ে দেয় খেতে। সন্ধ্যা-উত্তর অন্ধকার তখনও জমাট বাঁধেনি। সে অন্ধকার ভেদ করে হঠাৎ চিন্ময় আবির্ভূত হয়। লাথি মেরে উল্টে দেয় খাবার। কঠোর দৃষ্টিতে বোনকে শাসায়।

মণিকার যৌবনের বান ডাকা দেহ অস্তাচলগামী। বৈদ্যবাড়ির মেয়েদের এটা গতানুগতিক। উদ্বিগ্ন হবার কোন কারণ নেই। সুপাত্র নয়, কৌলীন্যই হন্যে হয়ে খুঁজে বেড়ায় ওরা। এ বাড়ির অনূঢ়া মেয়েদের বয়সটা চল্লিশে খট্‌খটায়। এটাই এ বংশের রীতি। কৌলীন্যের ঠাঁট বজায় রাখতেই মণিকার গণ্ডি সীমাবদ্ধ। সেই গণ্ডিতে একমাত্র পুরুষ মধু। চাকর-গোমস্তা হলেও মধু পরিপূর্ণ যুবক। একাকীত্ব মণিকাকে কুরে কুরে খায়। মধুর বাঁশি জ্বালাটা বাড়িয়ে দিয়েও একটা তৃপ্তি আনে। এ এক অন্য অনুভূতি।

অন্ধকার ঘরে চিন্ময় একা। মস্তিষ্কে ভীড় করে অপ্রত্যাশিত ঘটনা প্রবাহ। মা সস্নেহে কপালে হাত রাখেন, 'কী হয়েছে রে বাবা চিনু? তুই অত চুপচাপ থাকিস কেন? বৌমা, দাদু, দিদিভাই ওখানে ভাল আছে তো?'
'এ বাংলাদেশটা ছেড়ে ত্রিপুরায় যেতে মন চাইছেনা, মা। সে দেশটা আর দেশ নেই।'
'ওরা পড়ছে। বৌমাও ওখানে। তাহলে কী করবি? ফিরিয়ে নিয়ে আয় ওদের।'
'ওদের ফিরিয়ে আনা ঠিক হবেনা। এ দেশটাও সন্ত্রাসীতে ভরে গেছে।'
'তা'লে অত ভাবিস না, যা হবার হবে। না খেয়েতো আর মরবি না!'

'বৈদ্যবাড়ির মা হয়ে শুধু খাবার কথা ভাবলে! আমার ভাবনা যে অন্য।'

মায়ের মুখে আর কথা নেই। চোখে প্রশ্ন। অধীর অপেক্ষা পুত্রের মুখ চেয়ে।

'হিন্দুস্থানে শূদ্র জাগরণ শুরু হয়েছে, মা। ত্রিপুরা আরও একধাপ এগিয়ে। সেখানে চলছে দলিত রাজের কথা।' গভীর দীর্ঘশ্বাস চিন্ময়ের।

'তুই অত ভাবিস না। আমাদের মধু রয়েছে না? সেই আমাদের আগলে রাখবে।'

'মধুকে আমি নিতে পারব না, মা।'

'দেখ্ বাবা, সে মা-বাপ হারা ছেলে। ভাইদের কাছেও যায়না। আমাদের কাছেই পড়ে থাকে। মার আর কাট, সে যাবেনা কোথাও।'

'না মা, তা হবেনা। মধু তোমার কী ক্ষতি করতে পারে তা তুমি স্বপ্নেও ভাবতে পারবে না।'

চিন্ময়ের প্রতিক্রিয়ায় মায়ের ভেতরটা অশান্ত। মধুর ওপর তাব অবিশ্বাস তাকে মর্মাহত করে। অথচ মধুহীন এ বাড়ির প্রতিটি মুহূর্ত অচল। মধু আর মণিকার ওপর সবসময় তার বাঁকা দৃষ্টি। রাগে মায়ের শরীরের রক্ত দ্রুত সঞ্চালিত হতে থাকে। কঠোর হয়েই বলেন, 'অমন অসম্ভব মনগড়া কথা বলবি নাতো! মধু আমাদের একান্ত বিশ্বস্ত। ছোটবেলা থেকেই আমাদের বাড়িতে। মধু আমাদের কোন ক্ষতি করতে পারেনা!'

মায়ের দূরদর্শিতার বড়ো অভাব। তার বুকের ভেতরটা ফুটন্ত জলের উষ্ণতায় ফুটছে। মাকে বুকের ভেতরটা দেখাতে পারলে স্বস্তি পেত সে। এই মধুকে নিয়েই তার যত ভয়। একটা অঘটন ঘটা অস্বাভাবিক নয়। এদেশে অসম্ভব হলেও হিন্দুস্থানের ত্রিপুরায় তা সহজেই সম্ভব। মাকে কি আর সব কথা খুলে বলা যায়! অঘটনের আগেই ঘটে যাবে দক্ষযজ্ঞ।

নির্জন দুপুরে বাঁশি আর বাজে না। কিন্তু সুর-ছন্দহীনও নয় বাড়িটা। কোকিলের কুহু কুহু রব বন্ধ করবে কে? পরিত্যক্ত একটা ঘরেই মধুর স্থায়ী আবাস। মণিকা পা টিপে টিপে তার মুখোমুখি। মাথাটা তার নোয়ানো। সুঠাম সুগঠিত শরীর। কালো পাথরের নিপুণ ভাস্কর্যের মত স্থির।

'তুই পালিয়ে যা মধু। তোকে বাঁচিয়ে রাখার ক্ষমতা আমার নেই।'

'আপনাগোরে ছাইড়া আমি কই যামুগো দিদিমণি? আপনেরে, মা ঠাকুরুণরে না দেইখ্যা আমি ক্যামনে থাকুমগো দিদিমণি?'

'ভুলে যা সব। অত লোভ ভাল নয় মধু!'

'আমার কুনঅ লোভ নাই দিদিমণি। আপনাগ নিদ্দেশ মতই চলি, নইলে পইড়া থাকি। মরি-বাঁচি আপনাগ লগেই থাকুম।'

'তোর ভেতরটায় দুঃখ-কষ্ট নেই? রাগ নেই? অত মারলো, তুই একটু কাঁদলিও না!'

'ছোডকত্তাবাবু অন্নায় দেইখ্যা শাসন করছে। দুষের ত কিছু নাই। মাইর আর খিদায় আমার

কষ্ট অয়না। কষ্ট অয় ছোডলোক কইলে। জীবনডা আপনাগ মতন ভদ্দরলোকের বাড়িত কাটতাছে। অহনও ছোডলোক রইয়া গেলাম?'

মণিকার দুচোখের দৃষ্টি স্থির। হঠাৎ যেন শ্বাসরুদ্ধ। ভেতরের অব্যক্ত যন্ত্রণায় চোখ-মুখ বিকৃত হয়ে ওঠে। মধু মাথা না তুলেই বুঝতে পারে।

মণিকা শেষবারের মত দেখে। ছবির মত সুন্দর আদর্শ গ্রাম, বাতিসা। চৌদ্দগ্রাম থানার অনতিদূরে। ওপারের পাহাড় ঘেরা সবুজ বনানী তাকে হাতছানি দেয়। সব জেনে ফেলেছে সে। আজ রাতেই ওরা পাড়ি দেবে নতুন দেশ, ভারতে। ভারতের অঙ্গরাজ্য ত্রিপুরায়। চোরাপথে সংগোপনে, আদম-ব্যাপারীর সহায়তায়, অঢেল অর্থের বিনিময়ে। সরকারীভাবে প্রকাশ্যে যাবার কোন পথ খোলা নেই। দলিতরাজ, শূদ্রজাগরণ, নারীর অধিকার শব্দগুলি ওর বুকে ঝড় তুলতে থাকে । প্রত্যাশার বেলুন ওড়ে মহাশূন্যে। স্বপ্নের মত। সাবলীল গতিতে।

ঘন অন্ধকারের মধ্যরাত। সীমান্তে এসে আদাব জানায় মকবুল হোসেন। এ তল্লাটের কুখ্যাত আদম-ব্যাপারী। চিন্ময় হাতের আংটি খুলে উপহার দেয়। চোখের পাতায় কৃতজ্ঞতার কুয়াশা। ভিজে উঠে তির তির কাঁপে। বারবার আদাব জানিয়ে বিদায় নেয় সে। আড়ালে তার কুটিল হাসি। নিরাপদে ওপারে পা রাখতে ওরা এগোতে থাকে। হঠাৎ মধুর বুকফাটা আর্ত চিৎকার, 'ছোডকত্তাবাবু, দওরাইয়া যান! আরও জোরে দওরান! থামলে অরা হগ্‌গলেরে শ্যাষ কইরা ফালাইব!'

মধ্যরাতের নিস্তব্ধতা ভেঙে খান খান। সেই আর্ত চিৎকার পাহাড় ঘেরা সবুজ বনানীতে অনুরণিত। দুঃস্বপ্নের মত হৃদয় বিদারক। এক সময় প্রতিধ্বনি মিশে গিয়ে যেন অন্ধকারের ঘনত্ব বাড়িয়ে দেয়। উচ্চ শ্রেণীর কলঙ্কের মত তীব্র, সুগভীর।

মকবুল হোসেন সরে পড়তেই তার বাহিনীর লোকজন ঝাঁপিয়ে পড়ে চিন্ময়ের ওপর। তীরের মত ছুটে এসে মধু প্রতিরোধ করে। চিন্ময়কে আগলে রেখে তাদের তীক্ষ্ণ ফলার আঘাতে আঘাতে তার শরীর ফালা ফালা ।

চিন্ময় মা-বোনকে টানতে টানতে প্রাণপণে দৌড়য়। অনতিদূরে নিরাপদ স্থানে পৌছে হাঁফাতে থাকে সবাই। চিন্ময় বেহুঁসের মত বিহ্বল। মধুর চরম পরিণতির কথা ভেবে শিউরে ওঠে।

মণিকা উন্মাদের মত ফিরে যেতে উদ্যত হয়। মা জোর জবরদস্তি করে ধরে রাখেন। ব্যর্থ আক্রোশ আর অসহ্য বেদনার কান্নায় সে ভেঙে পড়ে মায়ের বুকে। মায়ের কঠোর দৃষ্টি চিন্ময়ের চোখে-মুখে স্থির হয়ে আসে। সে দৃষ্টিতে ঘৃণা না অবজ্ঞা কিছুই বুঝতে পারেনা চিন্ময়। শুধু অজানা এক ভয়ে কেঁপে কেঁপে উঠতে থাকে তার অন্তরের আত্মা ।

সম্পর্ক

মাথার উপর নির্দিষ্ট অক্ষে ঘূর্ণায়মান বৈদ্যুতিক পাখা। ধবধবে সাদা পরিচ্ছন্ন বিছানায় শুভ্র। পাখাটা সমগতিতে ঘূর্ণায়মান তার মনে হয়না। ওপব থেকে পাখাটা তার বুকের ওপর পড়লে, সে বেঁচে যেত। যৌথ কেবিনে নয়, ঝক্‌ঝকে বিশেষ কেবিনে সে একা। রোগটা তো ছোঁয়াচে নয়। ভাল থাকার জন্যেই পৃথক ব্যবস্থা। মনে মনে হাসে সে। বুকের ভেতরটায় একাকীত্বের জ্বালা। ডাক্তার আসবে পরে। সিস্টার আসছে না কেন? ওর শরীরটা তার মনে সুখের আলোড়ন তোলে। ক্রমশ উষ্ণতার সৃষ্টি। শক্তি সঞ্চয় করে উদ্‌গ্রীব সে। প্রতীক্ষারত মনটা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। সিদ্ধান্তে আজ সে অটল। সময়ের অপচয় আর নয়। পাখাটা নেমে আসছে না তো? না এলেই বাঁচে।

প্রতীক্ষার অবসান। পর্দা সরিয়ে সিস্টার ভেতরে। শুভ্রতার প্রতীক নয়। হালকা রঙীন পোষাক। নিচের পেছনের অংশটা ভারী। ঢুকেই একটা জানালা খোলে। অপেক্ষারত সূর্য রশ্মি হুমড়ি খেয়ে পড়ে। শুভ্রের বুকে ধুকধুকানি। অঘটনটা তো অন্ধকারেই নিরাপদ।
সিস্টার তার কাজে যথারীতি ব্যস্ত। নির্বাক। মুখটা গম্ভীর নয়। চোখ দুটি যেন হাসছে। তার দিকে গভীর মনোযোগ। কিন্তু চোখে চোখ পড়েনা। আশ্চর্য। শুভ্র ঘামছে। সিস্টার তার কপাল আর গলার ঘাম মুছে দেয়। ফিরে যেতে শরীর ঘোরে। শরীরের পেছনের অসমান অংশ তার মুখের সামনে। বাঁ হাতটা সামান্য দূরে। কাত হয়ে শুভ্র ওর ডান হাতটা টেনে ধরে। স্বয়ংক্রিয়ভাবেই অসমান শরীরটা আবার ঘোরে। চোখে চোখ স্থির। শুভ্র হাতটা ছাড়ে। চোখে অনুনয়। বিপরীত চোখে প্রশ্ন।

বুকে হাতুড়ির ঘা স্পষ্টতর। ঘূর্ণায়মান পাখাটা আরও ওপরে। এ মুহূর্তে প্রলয়ংকরী ভূমিকম্পে সে বেঁচে যেত। শান্তিও পেত। ঘটনার সম্ভাবনা দূর অস্ত। পলকহীন চোখ, স্থির। উপেক্ষা করে সব শঙ্কা। সাহস সঞ্চয় করে নির্ভীক। শরীরের কোষে উত্তেজনা। ঠোঁট থরথর। সীমাহীন কুণ্ঠায় বলে, 'সিস্টার, তুমি একটু বসবে?'

শুভ্রর গা ঘেঁষেই সিস্টার। অপ্রত্যাশিতভাবে সব উলটপালট। পরম যত্নে কপালে হাত। স্পর্শের অনুভূতি অব্যক্ত। সাদা আঙুল চুলের ভেতরটায় চষে। অবর্ণনীয় সুখ। সুখানুভূতিতে অবশ হৃদয়ের ভেতর অতিপ্রাকৃত কথার ঠেলাঠেলি। অকস্মাৎ মুখটা খোলে। বিরামহীন কথা অনেকক্ষণ।
'সিস্টার, তুমি হয়তো বিস্মিত, বিরক্ত। মৃত্যুপথযাত্রী রোগীর অস্বাভাবিক আচরণ, অসুস্থ আবেগ, এই ভেবেই অবজ্ঞা, উপেক্ষা? করুণায় পরম মমতার স্পর্শ? রোগটা ব্লাড ক্যান্সার,

আমার জ্ঞাতই। অজ্ঞাত ভেবে মা-বাবা সামান্য স্বস্তিতে আছেন। আমি ওদের হৃদয়টা আর টুকরো করতে চাইনা। মৃত্যুপথযাত্রীর মিথ্যে বলে কী লাভ? শিশু বয়স থেকেই আমি ব্রিলিয়ান্ট। শৈশবের অনেক কথা যেন স্মৃতিতে। জয়েন্ট এন্ট্রান্সে স্মরণীয় রেজাল্ট। কম্পিউটার সায়েন্স নিয়েই পড়াশোনা। জীবনটা সুশৃঙ্খল। মা-বাবার আশা-আকাঙ্ক্ষার সঠিক প্রতিফলন। সুন্দর, সুশৃঙ্খল মেধাবী বলে সবার প্রিয়। সহপাঠিনীদের সান্নিধ্যের নিরন্তর প্রয়াস। ওদের বিস্ময়কর চিঠিতেও আমি সাবলীল, মা-বাবার ত্যাগ তিতিক্ষার কথা মনে করেই। এত অনুশাসনে আমি কী পেলাম সিস্টার? চুপ থেকো না। কথা বল। তোমরা তো চিকিৎসা বিজ্ঞানের সাথে জড়িত। হলেই বা নার্স। আমার বুক জুড়ে ভালবাসার ক্ষিদে। প্রিয়াকে বুকে জড়িয়ে ধরার দুর্বার আকাঙ্ক্ষা। হৃদয়ের কথা এখনও অব্যক্ত। এরই মধ্যে যাবার আহ্বান! এই ঠোঁট এখনও নিষ্কলঙ্ক। কারও নরম উষ্ণ স্পর্শের স্মৃতিহীন। অনাস্বাদিত, পরিত্যক্ত। এখন বাসনা হলেও সুযোগ কোথায়? নিশ্চিত মৃত্যুপথযাত্রী রোগীর ঠোঁটে কে রাখবে ঠোঁট ভালবাসার দুঃসাহস নিয়ে? কেউ না।

'তোমার কথা ভেবে ভেবে ফুল্লতা আসে মনে। সাহসী হয়ে তোমার সুশ্রী হাতটা ধরি। তেমন ভাবে এই প্রথম। প্রিয়াকে নিয়ে সমুদ্রের ঢেউ গুণতে ইচ্ছে করে। ঝিনুক কুড়িয়ে আঁচল ভরিয়ে দেবার প্রবল বাসনা। আরও অ-নে-ক অ-নে-ক, সে তো আর হবার নয়। তোমার শরীরের জ্যামিতি আমার মুখস্থ। বারবার সুখের রোমন্থন। সংগোপনে, তোমার সম্পূর্ণ অজান্তে।'

ঠোঁটের ওপর মসৃণ হাতের মৃদু চাপ। কথা বন্ধ। শুভ্রের চোখ অপর দুটি চোখ খোঁজে। শরীরে শরীর স্পর্শ। মুখটা অন্যদিকে। ফিরে আসে টলটলে চোখ। দুহাতের আঙুল তার কপাল, চিবুক, গলায় সচল। তিরতিব কাঁপে। শির নিচে নামে। ঠোঁটের কাছে ঠোঁট আসতেই ডাক্তার। সিস্টার সরে দাঁড়ায়। শুভ্রের সব উত্তেজনা, উষ্ণতা অন্তর্হিত। অন্যায় বোধে ভেতরটা দগ্ধ, দ্বিধান্বিত । ডাক্তার সমাধানে উদগ্রীব। অস্বস্তিতে ভেতরটা অশান্ত। শুভ্রের কথাগুলি হৃদয় বিদারক। আত্মবিলাপ। আড়ালে দাঁড়িয়ে না শুনলেই হত। নিজের প্রথম যৌবনের বাঁধনহারা দিনগুলি এখনও স্মৃতিতে স্পষ্ট। সুখের হিল্লোলে মধুর উপভোগ। এ ভোগের গতি নিরন্তর, আমৃত্যু। অথচ শুভ্রের জীবনটা অনাস্বাদিত। শেষ দিনগুলো রাঙিয়ে দিতে চান ডাক্তার। স্মরণীয় করার পরিকল্পনা। অতৃপ্ত হৃদয়ে কিঞ্চিত পূর্ণতা। সীমিত ক্ষমতার জোরে পাংশু মুখে ফুলের হাসি, তপ্ত নিশ্বাসে মুক্ত বাতাস, হৃদয়ের বন্ধ দ্বার উন্মোচিত, মুক্ত বাতাসে সুস্থ পরিবেশ। মৃত্যুপথযাত্রী শুভ্রের কাছে এসব তুচ্ছাতিতুচ্ছ নয়। আকাশের মত ব্যাপক।

নতুন সিস্টার। ওর কর্তব্যে ব্যস্ততা নেই। শুভ্র দেখে। কিন্তু লক্ষ্য অন্তরের অন্তঃস্থলে। একটা সুরভিত সুবাস। সচকিত হয়েও স্বাভাবিক। শরীরের স্পর্শে মাদকতা। নীতিকঠোরতায় উপেক্ষা। সান্নিধ্যে কোষে কোষে উত্তাপ। অসম্ভব ভেবে উত্তেজনা প্রশমিত। কথার ছন্দ আর ঝকঝকে

দাঁতের ঝিলিকে অবশ। মুহূর্তে দিশেহারা। গন্ধ-ছন্দ-সান্নিধ্য আর স্পর্শে তার সব প্রতিবন্ধকতা ছিন্ন ভিন্ন। অন্তর্মুখী দৃষ্টি স্থানচ্যুত হয়ে সুগঠিত শরীরের সুন্দর মুখশ্রীতে আপতিত। পটল-চেরা চোখের উপর ঘন পক্ষ্ম। ঠোঁটে সামান্য হাসি। দুটি চোখ মিটিমিটি। পাতলা ঠোঁট দুটি থরথর। আধুনিকা হয়েও রুচিপূর্ণা। বিশাল চোখে নিজের সুস্পষ্ট প্রতিবিম্ব। হারিয়ে যাবার কামনা। দেয়াল ঘড়িতে চোখ শুভ্রের। অসময়ে নবীনার আগমন। জানালা বন্ধ, দরজাও। বৈদ্যুতিক পাখা স্থির। হঠাৎ আবিষ্কার বিদ্যুৎ নেই। সব ব্যতিক্রম। সেও ব্যতিক্রম ধর্মী .... স্বপ্নহীন গভীর ঘুমের অতল তল। অনেক অ-নে-ক দিন পর। গভীর প্রশান্তিতে ঘুম ভাঙে শুভ্রের। পাশে দাঁড়িয়ে নবীনা সিস্টার পর্ণা। কেবিন আলোকিত। বাইরে অন্ধকার। নবীনার শরীরে অন্য পোষাক। নির্বাক। লাজুক চোখে মাথা নিচু। তাহলে এতক্ষণ সব স্বপ্ন ? এ প্রশান্তি স্বপ্নের ? অবাস্তব, অলীক ? ডাক্তার ফিরে যেতেই তার পাশে পর্ণা। গা ঘেঁষে। দরজাটা বন্ধ করে বুকের ওপর আছড়ে পড়ে। সমুদ্রের ঢেউ এর মত উত্তুঙ্গ বুক, বুকে। ঘর্ষণে, আকর্ষণে, ঘর্ষণ। বিদ্যুৎস্পৃষ্ট ব্যক্তির মত প্রবাহ শরীরের কোষে কোষে। এক সময় নীরব, নিথর। বাস্তবতার এমন স্পষ্টরূপ স্বপ্নেও ভাবেনি শুভ্র।

কিছুটা সুস্থ বোধ করায় বাড়ি আসে শুভ্র। প্রতিদিন সকাল সন্ধ্যায় পর্ণাও। প্রেমের আকাশে ওদের বিচরণ মুক্ত বিহঙ্গের মত। যত্র তত্র সর্বত্র। কাজ নেই। পড়াশোনা নেই, কোন দায়িত্বও নেই। ওদের প্রতিটি মুহূর্ত মধুময়।

পর্ণা ওদের উদয়পুরের বাড়িতে। মা-বাবার অনুমতি নিয়ে শুভ্রও উদয়পুরে, মামার বাড়িতে। ছেলের কোন ইচ্ছেতেই ওরা বাদ সাধেন না। রাজন্য যুগের প্রাচীন রাজধানী উদয়পুর। মন্দির আর সরোবর নগরী। স্বাস্থ্যকর জাযগা। শুভ্রের কাছে এসব মূল্যহীন। পর্ণাই তার জীবনে মানসিক ও শারীরিক সুস্থতার প্রতীক। আশ্রমের পেছনে ওরা, গোমতীর তীরে। পাশাপাশি অনেকটা ঘেঁষাঘেঁষি। গোমতীর বুক থেকে শীতল বাতাস ওদের শরীরে শান্তির প্রলেপ বুলিয়ে দেয়। শুভ্রের মনে দ্বিধা, অপরাধবোধ। মুখটা খুলতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। পর্ণার সান্নিধ্য-সুখে ভুলে যায় সব।

অনুশোচনায় দগ্ধ শুভ্র। প্রেমে শঠতার স্থান নেই। প্রেম নির্মল, নিঃস্বার্থ, নিষ্কলুষ। অসুস্থ বোধ করে বাড়ি ফিরে অসে। মাকে জড়িয়ে অনেক কাঁদে। মা-বাবার অনুমান ওর কষ্টটা বাড়ছে। ছোটবেলার মত মাকে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়ায়।

ডাঃ চৌধুরীর নার্সিং হোমে জরুরী সংবাদ যায়। ডাঃ চৌধুরী তার রুমে একা। অন্ধকারে বিষণ্ণ। শুভ্রের বাবার কাছে এসব গুরুত্বহীন। ছেলের জন্যে কঠোর পদক্ষেপেও প্রস্তুত। ডাঃ চৌধুরীকে নিয়ে যাবেনই। ডাঃ চৌধুরী সব শুনেও নির্বাক। ছোট্ট ব্রিফকেসটা নিয়েই গাড়িতে ওঠেন।

শুভ্রদের বাড়ির চারদিকে জনারণ্য। ভীড় দুভাগ হয়ে পথ তৈরি। অপ্রত্যাশিত ঘটনায় শুভ্রের বাবার আর্তনাদ। মৃত শরীরটার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েন। শুভ্রের প্রাণহীন দেহের উপর মা অচৈতন্য। ডাঃ চৌধুরী স্পর্শ করেন শরীরটা। না, কোন উষ্ণতা নেই। উষ্ণতাহীন শরীরের পাশে একটা ছোট্ট শিশি। শিশির নিচে ভাঁজ করা ছোট্ট কাগজ। সবার অজান্তেই তুলে নেন ডাঃ চৌধুরী।

চেম্বারে ঢুকে ভাঁজ খুলে দেখেন, পর্ণাকে শুভ্র। পর্ণার নামটা দেখেই ডাঃ চৌধুরীর বুকের ভেতরটায় তীব্র মোচড় । মৃত্যুপথযাত্রী রোগিনী জেনেও গত দুদিনের প্রতিক্ষণে অনুশোচনায় দগ্ধ পর্ণার মনপ্রাণের পরিসমাপ্তি। ড্রয়ার টেনে ভিজে দুমড়ানো কাগজটা বের করে খুঁটিয়ে দেখেন, শুভ্রকে পর্ণা। গোমতীর জলে ভেসে ওঠা মৃতা পর্ণার শরীরে পাওয়া চিরকুট। নদীজলে ভিজে অস্পষ্ট। ডাঃ চৌধুরী দুটোই টেবিলগ্লাসের ওপর মেলে ধরেন। দুজনের চিঠি দুটিতে স্পষ্টভাবে প্রতিফলিত, আত্মগ্লানিতে দুজনের আত্মাহুতি।

খোদার কসম

কাসেম মিয়ার লোভাতুর দৃষ্টির হাত থেকে বাড়ন্ত শরীরটাকে বাঁচাতে সুতপা কথার ফাঁকে ফাঁকে শাড়ির আঁচল টেনে ব্যর্থ চেষ্টা করছে। উদয়পুর ব্রিজ চৌমুহনিতে সনাতন সরকারের 'হোমিওপ্যাথি পার্বতী ক্লিনিক'-এর একটা সরু ঘুনে ধরা বেঞ্চিতে বসে কাতর আবেদন জানায় সুতপা।
হোমিওপ্যাথি পুরিয়া তৈরি করছে সনাতন ডাক্তার। মাথাটা নিচু করে নাকের ওপর রাখা চশমার ফাঁক দিয়ে সুতপাকে বারবার দেখে, শুনে যায় কথা, বলে খুব কম। কাসেম মিয়ার চোখ যেন সুতপার শরীরটাকে ধর্ষণ করছে। প্রৌঢ় সনাতন ডাক্তারের দু'চোখ তার শরীরের অন্ধি সন্ধিতে ঘুরে বেড়ায়। অস্বস্তি বোধ করে সুতপা।

স্বামীকে উগ্রপন্থীর হাত থেকে বাঁচাতে আলুথালু বেশে পূর্ব গকুলপুর থেকে এসেছে সুতপা। মনোজ মাষ্টার একজন প্রাইমারি স্কুলের শিক্ষক। সৎ-সজ্জন-সরল মনের মানুষ। তার বাড়ি থেকে উগ্রপন্থীরা তাকে তুলে নিয়ে যাবে, সে স্বপ্নেও ভাবেনি। প্রথম কয়েকদিন অনেকে খবর নিয়েছে, দুঃখ করেছে, আশা দিয়েছে, পরামর্শও দিয়েছে। এখন কেউ খুব একটা দেখা করেনা, খবরও নেয়না। পাঁচ বছরের মুন্না আর সাত বছরের রূপাকে নিয়ে অকূল পাথারে ভাসছে সুতপা।
গত তিন মাসে সুতপা শিখেছে অনেক । উগ্রপন্থীর নামে এ রাজ্যে কী চলছে, অনেক জেনেছে। উগ্রপন্থীর কবলে স্বামীর কষ্টের কথা ভেবে ভেবে তার চোখ এখন জলশূন্য। বুকটা পাথর হয়ে গেছে। পাথরের নিচে কোমল অংশ ব্যথায় তোলপাড় হতে থাকে। ছুটে আসে সনাতন ডাক্তারের কাছে। দুটি সন্তান নিয়ে সে যে বেঁচে আছে, এ এক আশ্চর্য ঘটনা।

রাজারবাগের সনাতন সরকারের জমিজমা কিছুই নেই। হোমিওপ্যাথি ডাক্তারিতে আমদানি তেমন না হলেও বেশ ঠাটের সঙ্গেই থাকে। বিধাতা তার মাথায় অনেক বুদ্ধি ঢুকিয়ে দিয়েছেন। সে বুদ্ধির সামান্য খরচ করে যথেষ্ট আমদানি হয়। ঠাটবাট বজায় থাকে। থানার সঙ্গেও তার দহরম মহরম আছে। মানুষ তাকে সমীহ করে এড়িয়ে চলে। পেছনে বলে হারামজাদা ইনফরমার, টাউট, স্পাই, বাটপার।
রাজনগরের কাসেম মিয়ার সঙ্গে সনাতনের দোস্তি, আশির জুনের দাঙ্গার পরেই। কাসেমের জমিজমা আছে। নিজে কিছুই করেনা, ভাগে চাষ হয়। তার নেশা হচ্ছে মেয়েমানুষের শরীর। নারীলোলুপ কাসেমের জীবনে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হচ্ছে, বিবি বদল আর তালাক। একটি রাজনৈতিক দলের সাথে তার ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ আছে । দেদার টাকা খরচ করে। উদয়পুরের

আশপাশের মুসলমানেরা তাকে ঘৃণার চোখে দেখলেও কিছু বলবার বা করবার সাহস পায় না। আড়ালে সবাই বলে উগ্রপন্থীর সাগরেদ। পুলিশও তার কাছ থেকে খবরাখবর নেয়। সম্প্রতি সে আগের বিবিকে তাড়িয়ে দিয়ে বাংলাদেশ থেকে এক সুন্দরীকে সাদি করে এনেছে। এটা তার পঞ্চম সাদি। তালাকের নিয়মকানুন সে মানে না।

সন্ধ্যার পরই ব্রিজ চৌমুহনি আজকাল জনশূন্য হয়ে যায়। উগ্রপন্থীর বিভীষিকায় রাতে গাড়ি চলাচল হয়না বললেই চলে। সুতপা কাতর মিনতি করে বলে, 'ডাক্তারবাবু, আপনি বাপ কাকার সমান। আমারে বাঁচান। রূপার বাপেরে আইন্যা দেওনের ব্যবস্থা কইরা দ্যান। দুইডা পোলা-মাইয়া লইয়া এই তিনডা মাস ক্যামনে কাডাইতাছি স্বয়ং ভগবান ছাড়া আর কেউ বুঝত না।'

সনাতনের বুকে মায়া মমতা আর দয়ার স্থান নেই। শ্লেষ মিশিয়ে সে জবাব দেয়, 'এই পাণ্ডব বর্জিত জাগায় কেউ কারঅ বাপ-কাহা-মাইয়া না। নিজেরডা নিজেরই করতে অইব।'

ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে সুতপা। নিজেকে একটু সামলে নিয়ে আবার বলতে থাকে, 'এর লাইগ্যাঅই আপনার কাছে ছুইট্যা আইছি।'

'দেখ মনোজ মাষ্টারের বউ, এতদিন তুমি নানান মানুষেরে লগে লইয়া আইছ। হক্কলের সামনে ত আর এইসব কতা কওন যায়না। কার মনে কী আছে কেডা কইব?'

'আইজ ত আমি একলা আইছি। আমারে বাঁচান। আমার সংসারডারে বাঁচান।'

'এইডা ভাল করছ।'

সনাতন ঘাড় ঘুরিয়ে চশমার ওপর দিয়ে কাসেমের দিকে তাকায়। কাসেম দুচোখ দিয়ে এক বিচিত্র ইশারা ছড়িয়ে দেয়। সুতপার বুকটা সাঁৎ করে ওঠে। আঁচল টেনে অবাধ্য বুকটাকে সামলে, জড়সড় হয়ে বসে। সনাতনের মুখে অস্পষ্ট হাসির রেখা ফুটে উঠে মিলিয়ে যায়। পুরিয়া তৈরি বন্ধ করে দু'চোখ বুজে একটু চিন্তা করে সনাতন খুব আস্তে বলে, 'মাষ্টারের বউ, তুমিত আর দুই লাখ টাকা দিতা পারতানা। কত দিতা পারবা ঠিক কইরা কও। হেইভাবে আমরার আগ্গাইতে অইব।'

'বাবু, দুই লাখ টাকা ক্যান আমি পঞ্চাশ হাজার টাকাও দিতে পারুম না। বাড়িডা বেইচ্চা না অয় হাজার বিশেক দিতাম পারুম। আর ভাইয়েরা হক্কলে মিল্যা বিশ হাজার দিব কইছে।'

'তাইলে তুমি কাসেম ভাইয়ের লগে কতা কও। দিল উলা মানুষ। আমার বিশ্বাস তোমার লাইগ্যা ব্যবস্থা একটা করব।'

'না না ডাক্তারবাবু, যা করনের আপনে করেন। ভগবানের কাছে ভালা পাইবেন। আপনের হক্কল কথা আমি শুনুম।'

'আমি বুড়া মানুষ। তোমার মত রূপসীরে কী করুম?'

সনাতন বিপরীত দিকে বসা কাসেম মিয়ার দিকে দৃষ্টি দিতেই সুতপার বুকের ভেতরটা

অজানা ভয়ে কেঁপে ওঠে। হঠাৎ লোডশেডিং-এর জন্যে অন্ধকারটা ঘন হয়। আকাশে চাঁদ নেই। ব্রিজ চৌমুহনিতে নেমে আসে রাত্রির গভীরতা। দুর্ভাগ্যকে মেনে নিয়ে অনিশ্চিত ভবিষ্যতের দিকে পা বাড়ায় সুতপা। ফিরে যাচ্ছে পূর্ব গকুলপুরে নিজের বাড়িতে।

সনাতন উঠে গিয়ে বেঞ্চিতে বসে থাকা কাসেমের কাছে ফিসফিস করে কানে কানে কিছু একটা আলোচনা করে। পেছন থেকে সুতপাকে ডেকে বলে, 'আমরার দরকার না অইলে কোন কথা নাই। যদি দরকার অয় কাইল সকাল দশটার মধ্যে আমার ইখানঅ আইলে কাসেম ভাইয়ের লগে দেখা করতা পারবা। আমি থাকুম না। অন্য কামে যামু।'

পরদিন সুতপা ব্রিজ চৌমুহনিতে এসে দেখে সনাতন ডাক্তার নেই। বেঞ্চিতে বসে আছে এক অপূর্ব সুন্দরী যুবতী বউ। পাশে বসে অনেকক্ষণ আলাপ করে সুতপা বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যায়। কাসেম মিয়ার বউ অত সুন্দরী? এ যে বাঁদরের গলায় মুক্তার হার!
কাসেম হন্তদন্ত হয়ে এসে একটা চিঠি সুতপাকে বাড়িয়ে দিয়ে বলে, 'এই নেন মাষ্টারের চিডি। আমার কাম আমি করলাম। দরকার অইলে কইয়েন।'

চিঠিটা পড়ে সুতপার হাত-পা কাঁপতে থাকে দুশ্চিন্তায়। ঘর-বাড়ি-পথ-ঘাট সব যেন ঘুরছে। চোখে সব অন্ধকার দেখছে সুতপা। মনোজ মাষ্টার অসুস্থ। পেট ব্যথায় খুব কষ্ট পাচ্ছে। উগ্রপন্থীর হাত থেকে ছাড়া পেয়ে বাঁচলেও রোগের হাত থেকে বাঁচার আশা কম। যেমন করেই হোক, টাকা জোগাড় করে যত দ্রুত সম্ভব তাকে যেন উদ্ধার করা হয়। ফিরে এসে টাকা পরিশোধ করা যাবে। মৃত্যুর আগে স্ত্রী-সন্তানদের একবার দেখতে তার খুব ইচ্ছে হচ্ছে।

সেদিন বিকেলেই কাসেম মিয়া মনোজ মাষ্টারের বাড়ি যায় সুতপার আহ্বানে। কাসেম সুতপার সঙ্গে দীর্ঘ আলোচনা করে সব ঠিক করে নেয়। রবিবার সুতপা কাসেম মিয়ার সঙ্গে সকাল দশটায় রওনা হয়ে নিত্যবাজারে যাবে। উগ্রপন্থীদের হাতে সোয়া লাখ টাকা তুলে দেবে। পরদিন সন্ধ্যায় মনোজ মাষ্টারকে ছাড়া হবে। আস্তে আস্তে সে টাকা পরিশোধ করে দিলেই হবে। একজন সৎ মানুষের জন্যে এই উপকার করতে পারলে কাসেম নিজেকে ধন্য মনে করবে।
রবিবার সকাল এগারোটায় সনাতন ডাক্তারের পার্বতী ক্লিনিকে কাসেমের স্ত্রী জোছনা বিবি এসে জানায়, কাসেম মনোজ মাষ্টারের স্ত্রীকে নিয়ে পিত্রা চলে গেছে। সনাতনের মেয়ে সবিতাকে নিতে এসেছে সে। সবিতা গোমতীর অপর পাড়ে রাজনগরে প্রাচীন ভুবনেশ্বরী মন্দির আর পুরানো রাজবাড়ি দেখতে চেয়েছে। কাসেমের বউ-এর অনবদ্য যৌবনশ্রী দেখে সনাতনের মিইয়ে আসা ঠাণ্ডা রক্তেও যেন আগুন ধরে যায়। হাসিমুখে সম্মতি দিয়ে জানিয়ে দেয়, সন্ধ্যার আগেই যেন বাড়ি ফিরে আসে।
সবিতা খুশিতে আটখানা হয়ে জোছনা বিবির সঙ্গে বেরিয়ে পড়ে। সবিতা রূপসী না হলেও

কচি বয়সের ভেতর ফুটে রয়েছে নিটোল স্বাস্থ্যের যৌবনশ্রী। প্রথম যৌবনের উন্মাদনা রসে রঙিন প্রজাপতির মত উড়ে বেড়ায়, নির্বিকার পুরুষের মনেও আগুন ধরিয়ে দিতে চায় সে।

নিত্যবাজারে একটা দোকানে সুতপাকে বসিয়ে রেখে কাসেম যে গেছে ফিরে আসে সন্ধ্যায়। অপেক্ষায়, বিরক্তিতে, ভয়ে, দুঃশ্চিন্তায় আর অসহ্য মর্মদাহে তার বুকের ভেতরটা কুরে কুরে ক্ষয় হতে থাকে। সন্ধ্যার অন্ধকারে কাসেমের দেওয়া সওয়া লাখ টাকার প্যাকেটটা তুলে দেয় সুতপা। পরদিন সন্ধ্যায় মনোজ মাষ্টারকে মহারাণীর লাভষ্টোরি বাজারে ছেড়ে দেওয়া হবে এই আশ্বাস দিয়ে ওরা ফিরে যাচ্ছে। কয়েক মিনিটের মধ্যে ওরা ফিরে এসে জানায় যে, মাষ্টার অসুস্থ। হেঁটে যেতে পারবে না। একটা গাড়ি নিয়ে এসে তাকে যেন ফিরিয়ে নেওয়া হয়।

ক্লান্ত দেহে আর হতাশ মনে সুতপা কাসেম মিয়ার সমান তালে হাঁটতে গিয়ে অবসন্ন হয়ে পড়ে। সারাদিন তার মুখে কিছুই ওঠেনি। কাসেমেরও না। ওর জন্যে কাসেম অনেক করেছে। আর্থিক, শারীরিক, মানসিক — সবদিক দিয়ে সাহায্য করেছে। অনেক কষ্ট ভোগ করেছে। রাতের ঘন অন্ধকারে কাসেম সুতপাকে নিয়ে ফোটামাটিতে তার খামার বাড়িতে গিয়ে ওঠে। একটা লোক খাবারের আয়োজন করে দিয়ে কোথায় যে গেল সুতপা বুঝতে পারেনা। সময় নষ্ট না করে সুতপা দুধ, কলা, পেঁপে, পাউরুটি ইত্যাদি খেয়ে নেয় দ্রুত। আবার হাঁটতে হবে। খেয়ে একটু বিশ্রাম নিতে গিয়ে অবসন্ন সুতপা ঘুমিয়ে পড়ে।

ভোরের আকাশ ফরসা না হতেই সুতপা তার বিধ্বস্ত শরীরটাকে টেনে নিয়ে অতি কষ্টে বাড়ি ফিরছে। তার শরীরটা দুমড়ে মুচড়ে এক রাতেই নিঃশেষিত হয়ে গেছে। মানুষ যে পশুর চাইতেও হিংস্র হতে পারে তা সুতপা এই জানল। শরীরের কোমল ও নরম অংশের প্রতিটা ইঞ্চি জমাট বেঁধে ফুলে রক্তাক্ত হয়ে আছে। একা ঘরে ফেলে আসা সন্তানদের কথা ও উগ্রপন্থীর কবলে স্বামীর অসুস্থতা, এ মুহূর্তে সুতপা কিছুই মনে করতে পারেনা।

রাজনগরে নিজের বাড়িতে ফিরে কাসেম দেখে সনাতন ডাক্তার রক্তহীন ফ্যাকাশে মুখে গালে হাত দিয়ে পাথরের মূর্তির মত বসে। হঠাৎ কাসেমকে দেখে সনাতনের মাথায় রক্ত উঠতে থাকে। তীব্র ক্রোধ ও ক্ষোভে অন্তরের দুর্নিবার জ্বালা শরীরের কোষে কোষে ছড়িয়ে পড়ে। প্রৌঢ় বয়সের রক্ত তীব্র রাগ বেশিক্ষণ ধরে রাখতে পারেনা। ঠকঠক করে কাঁপতে কাঁপতে পড়ে যেতে যেতে হাত থেকে ছিটকে বেরিয়ে পড়ে কাগজের একটা চিরকুট।

চিরকুটটা তুলে নিয়ে এক বিভীষিকাময় উগ্রপন্থী সংগঠনের ছাপ দেখে কাসেম তার দুচোখের বিস্ফারিত দৃষ্টিতে পড়তে থাকে। শরীরের রক্ত হিম হয়ে আসে তার। তার বিবি আর সনাতন ডাক্তারের মেয়ে সবিতাকে ওদেরই অন্তরঙ্গ বৈরী সংগঠনের সদস্যরা তুলে নিয়ে গেছে। সাতদিন পর শেষ রাতে পিত্রা বাজারের পাশে রেখে যাবে। থানা পুলিশে জানালে

ভয়াবহ পরিণতির জন্যে তৈরি থাকতে হবে। নতুবা আগের মতই চলতে থাকবে তাদের সংযোগ, সম্পর্ক ও লেনদেন।

প্রৌঢ় সনাতন কাতরাতে কাতরাতে শরীরের সমস্ত শক্তি কেন্দ্রীভূত করে উঠেই কাসেমের বুকের উপরের ফতুয়ার অংশবিশেষ দুহাতের মুঠোতে খাবলে ধরে। তীব্র ক্রোধ প্রকাশ করে বলে, 'কাসেম্যা, তরে আমি পুলিশে দিমু। তর কারসাজিতেই আমার মাইয়াডার সর্বনাশ অইলো!'

এক ঝটকায় নিজের ফতুয়ার অংশ সনাতন ডাক্তারের মুঠো থেকে মুক্ত করে কাসেমের প্রত্যুত্তর, 'অত চিল্লাইয় না। তোমার মাইয়ারে নিছে, আমার বউরে নিছে না?'

সনাতন ডাক্তারের তীব্র ঘৃণায় ব্যঙ্গোক্তি, 'বছর বছর যে বিবি বদলায় তার আবার বউয়ের চিন্তা!'

কাসেম এবার তীব্র ক্রোধ প্রকাশ করে বলে, 'দুনিয়ার হগ্গল কিছু বোঝ, আর এই কথাডা বোঝনা যে কিছু পাইতে অইলে কিছু ছাড়তে অয়?'

ভেতরে দুর্নিবার জ্বালা নিয়েই নির্বাক সনাতন ডাক্তার। কিন্তু মস্তিষ্ক তোলপাড়। মেয়ের পরিণতি, ভবিষ্যত ও সমাজের কথা ভেবে শিউরে ওঠে। মনোজ মাষ্টারের বউয়ের মুখটাও ভেসে ওঠে হঠাৎ। পরপর আরও অনেকগুলি দুমড়ানো নারী মুখ। এবার সম্পূর্ণ ভেঙে পড়ে সনাতন। বিলাপের সুরে বলতে থাকে, 'জানাজানি না অইতে আমার মাইয়াডারে আইন্যা দে কাসেম! তর খোদার কসম!'

সম্পৃক্তি

সোনালীর ব্যবহারে অসহিষ্ণু অর্ঘ্য। তার কপালে ভাঁজ পড়ে। শরীরের রক্ত টগবগ করে ফুটতে থাকে। মনে সন্দেহের মেঘ ঘনীভূত হয়। স্পষ্টভাবে জানতে চায়, 'তুমি নাটকে যাবে কিনা, বল?' সোনালী অত্যন্ত কাতর হয়ে বলে, 'তুমি শুধু শুধু রেগে যাচ্ছ। আজ আমার নাটকে যেতে মন চাইছে না। আমি ব্রহ্মচারী সাধুর আশ্রমে যাব। তিনি সুখ সম্পর্কে বলবেন।'

'আমি এত আশা নিয়ে অফিস থেকে তাড়াতাড়ি এসেছি তোমাকে নিয়ে যাব বলে। আমি কোনদিন ভাবতেও পারিনি সোনালী, তুমি ব্রহ্মচারী সাধুর কাছে যাবার জন্যে আমার অনুরোধটা উপেক্ষা করবে!'

'তুমি ছোট্ট ব্যাপারটাকে বড় করে দেখে অহেতুক কষ্ট পাচ্ছ। একবার সাধু ব্রহ্মচারীর কথা শুনলে তোমার মনটাও তৃপ্তিতে ভরে উঠবে।'

অর্ঘ্য অবাক হয়ে যায় সোনালীর পরিবর্তনে। নাটক-সিনেমা পাগল সোনালীর মনে বৈরাগ্য ভাবের আগমনে সে কৌতূহলী হয়ে ওঠে। জমজমাট হিন্দি ছবিতে উষ্ণ ঘনিষ্ঠতা, চটুল নাচগান ও অশ্লীল বাক্যালাপ না থাকলে সোনালী তৃপ্তি অনুভব করেনা। হঠাৎ মনের এই অভাবনীয় পরিবর্তন! অর্ঘ্যের রাগ-অনুরাগ তাব কাছে গুরুত্বহীন? এক বিশাল প্রশ্নবোধক চিহ্ন যেন তার চোখের সামনে ভেসে উঠছে।

সোনালী তো জানে অর্ঘ্যের ধর্মে বিশ্বাস নেই। সাধু, সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারীদের প্রতি তার ভক্তি-শ্রদ্ধা নেই, বিশ্বাসও নেই। তাদের শুভ্র, পরিচ্ছন্ন ও পবিত্র বেশের পেছনে কী আছে সে অনুমান করতে পারে। কিন্তু সোনালীর অবস্থাটা সে সঠিকভাবে অনুমান করতে না পেরে ভেতরে ভেতরে ফুঁসছে। সাধু ব্রহ্মচারীর প্রতি তীব্র আকর্ষণ, বেপরোয়া ভাব, নাকি অর্ঘ্যকে উপেক্ষা করে এড়িয়ে যাচ্ছে, অর্ঘ্য ঠিক বুঝে উঠতে পারে না।

বিরক্ত হলেও সহজভাবে মেনে নেওয়ার ভাব দেখিয়ে অর্ঘ্য বেরিয়ে যায়। কিন্তু নাটকে সে আজ যাবে না। আজ ব্রহ্মচারী সাধুকে দেখবে। তার ভাষণ শুনবে। কী যাদু তার মুখ নিঃসৃত অমৃতধারায়! অর্ঘ্য হাতে একটা ছোট্ট টর্চ নিয়ে আশ্রমের বড় জাম গাছটার পেছনে দাঁড়িয়ে দূর থেকে সবার আগমন লক্ষ্য করে। প্রচুর লোক সমাগম। অবশ্য লোক সমাগম না বলে মহিলা সমাগম বলাই ঠিক হবে। পুরুষের সংখ্যা দশ শতাংশের বেশি হবে না।

কিছুক্ষণ পরেই সাধু ব্রহ্মচারী এসে বসতেই অর্ঘ্য চমকে ওঠে। গলার আওয়াজ শোনার সাথে সাথেই সে নিশ্চিত। শ্মশ্রুযুক্ত গাল-চিবুক হওয়া সত্ত্বেও দুলুকে চিনতে অর্ঘ্যের কোন অসুবিধা

হয়নি। ধনী মা-বাবার সন্তান দুলাল চৌধুরী। কৈশোর থেকেই যুবতী মেয়েদের উষ্ণ সান্নিধ্য তার একমাত্র কাম্য। মেয়েদের সান্নিধ্য ছাড়া তার পক্ষে বেঁচে থাকা সম্ভব ছিলনা। তার মুখে হাসি। সে হাসি নির্মল, পরিচ্ছন্ন।

কিন্তু গুরুগম্ভীর মন ভুলানো শব্দে তার চিন্তায় ব্যাঘাত ঘটে। সাধু ব্রহ্মচারীর আগমনে পরিবেশ শঙ্খ ঘন্টা ধ্বনিতে মুখরিত না হয়ে নিস্তব্ধতা বিবাজ করছে। শ্রোতার মন অতীন্দ্রিয় রাজ্যে চলে যায়।

'সুখ কাকে বলে? সুখ কী? কীভাবে সুখ সহজে লাভ হয়? আমরা যখন তৃপ্তি, আরাম, আনন্দ ও স্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করি তাকে সুখ বলে। সুখ হচ্ছে আনন্দদায়ক মানসিক অনুভূতি। সুখের আবির্ভাবে আমাদের শরীরে ও মনে শিহরণ ও রোমাঞ্চ জাগে।
'কীভাবে সুখ সহজে লাভ করা যায়, তা এক কথায় প্রকাশ করা কঠিন। আমরা জানি আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হলেই সুখ এবং অপূর্ণ থাকলেই দুঃখ। সুখ-দুঃখ আমরা যা অনুভব করি, সেই অনুভূতি ইন্দ্রিয় ও বিষয়ের সংযোগে সৃষ্টি হয়। আমাদের মন, ইন্দ্রিয় ও বুদ্ধিতেই এই অনুভূতি জাগ্রত থাকে।
'সুখের আশায মন সর্বদাই ব্যস্ত। আর এই সুখ ইন্দ্রিয় সুখ। অশান্ত মনকে যতই অন্যদিকে সরিয়ে নিতে চেষ্টা করিনা কেন, মন সেই অভাবের দিকেই ধাবিত হয়। চঞ্চল মন যেন-তেন-প্রকারেণ সুখ পেতে চায়। পরিণামে বিপদ হয়। কিংবা ক্ষণিকের সুখের পর দুঃখ এসে জোটে। আমাদের জীবনে সুখের পর দুঃখ, বিপর্যয় নেমে আসে। সুতরাং সুখ আমাদের এমনভাবে কামনা করা উচিত, যাতে পরবর্তীকালে দুঃখ এসে না জোটে। দুঃখ না থাকাটাই সুখ আর সুখের অভাব হচ্ছে দুঃখ।'

কিছুক্ষণ শুনেই অর্ঘ্য বিস্ময়ে হতবাক। দুলু ওরফে দুলাল চৌধুরী তার অবয়বটা সাধু-ব্রহ্মচারীর মত তৈরি করলেও তার অত সুন্দর জ্ঞান ও বাচনভঙ্গী অর্জিত হল কী করে? লেডি কিলার, রমণী আসক্ত, লম্পট ইত্যাদি যার সঠিক বিশেষণ, ব্রহ্মচারী সাধু হিসেবে সে সফল হল কী করে? অর্ঘ্য অনেক চিন্তা করেও তার কূল কিনারা পায়না।

একটা বিশেষ ঘটনায় উনিশশ' পঁচাত্তরে অর্ঘ্যের বাংলাদেশের চাঁদপুরের কাছে মেহারে যাবার প্রয়োজন হয়েছিল। ভিসা পাবার তিনদিন পরেই বাংলাদেশের স্থপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানকে তাঁর পরিবারের সব সদস্যের সাথে খুন করা হয়। বাংলাদেশের অবস্থা টালমাটাল। দুলু সঙ্গে যেতে রাজি। প্রথমটায় সে তার এক বান্ধবীকে সঙ্গে নিয়ে যেতে চেয়েছিল। অর্ঘ্যের কঠোরতা বিবেচনা করে সে আশা পরিত্যাগ করে। ওর সাথে সুবোধ বালকের মতই সাথী হয়।
কুড়িদিনের বাংলাদেশ ভ্রমণে সে কমপক্ষে একুশটি মেয়ের সংস্পর্শে এসে অন্তরঙ্গ হয়ে ওঠে। মেয়েরা পতঙ্গের মত উড়ে এসে তার আগুনে পুড়তে থাকে। কিশোরী, যুবতী, বধূ, প্রৌঢ়া

সব শ্রেণীর নারী তার আগুনের তাপে ছ্যাঁকা খেয়েছে।
কুমিল্লার কান্দির পাড়। জীবন বীমার কোয়ার্টার।
'রেহানা ভাবী, তুমি অত সুন্দরী, অথচ সব সময় কালকাপড় দিয়ে শরীর-মুখ ঢেকে রাখ কেন?'
'তোমাদের আকর্ষণ বাড়াবার জন্যে। তুমি এখন যত উত্তপ্ত হয়েছ, পথে ঘাটে খোলামেলা দেখলে জাগ্রত হতে সময় লাগতো।'
দুলাল জানতে চায়, 'সাহেব টের পেলে কী করবে ভাবী?'
রেহানার ঝটপট উত্তর, 'তোমার সাথে ইণ্ডিয়ায় চলে যাব।'
'টাকা পাব কোথায়?'
'তোমার কত টাকা চাই? প্রতি দুপুরে তুমি এক হাজার টাকা নিয়ে যেও।'
কুমিল্লা জেলার চৌদ্দগ্রাম থানার বাতিসা গ্রাম। আবিদা খাতুন দুলালের চুল টেনে জিজ্ঞাসা করে, 'এ্যাই চোর, আমার ঘরে কেন?' দুলাল চুপি চুপি বলে, 'তোমার বাবা নুরা ডাক্তার হিন্দুদের অত্যাচার করেছে। আমি তার প্রতিশোধ নিচ্ছি। তোমার আপত্তি থাকার কথা নয়।'
'অত্যাচারে কি সুখ পাওয়া যায়? হারিয়ে যাওয়া যায়?'
'আমি অত্যাচারী, অত্যাচারিত হইনি, বুঝব কেমন করে?'

চট্টগ্রাম সমুদ্র বন্দরের কাছেই হালিশহর ন্যাশনাল কটন মিল। অর্ঘ্যের এক আত্মীয়ের কোয়ার্টারে উঠেছে দুলাল। পাশের কোয়ার্টারের রিক্তা চট্টগ্রাম শহর ও সমুদ্র বন্দর দুলালকে রাতদিন ঘুরে ঘুরে দেখিয়েছে। ফেরার সময় নিঃস্ব রিক্ত হয়ে রিক্তা প্রশ্ন করে, 'আমার কী হবে দুলাল?' দুলাল আদর করে এক টুকরো কাগজে একটা ঠিকানা লিখে তার হাতে তুলে দেয়।

চাঁদপুরের নতুন বাজার। হোটেলে খেতে বসে দুলাল। হিন্দুস্থান থেকে আগত হিন্দু ছেলে দেখে হোটেল মালিকের মায়া পড়ে। দুলালকে বাড়িতে নিয়ে আসে। আদর-যত্ন-আপ্যায়নে ও মুখরোচক খাদ্যের বিপুল আয়োজনে সে তিনদিন সেই বাড়িতে। তার আগ্রহ মালিকের সুন্দরী যুবতী মেয়ে সুনন্দা। জামাই হবার আগেই সে ঈপ্সিত কাজটি শেষ করে। স্বল্প শিক্ষিতা সুনন্দা দুলাল ফিরে যাবার সময় ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে।

কুমিল্লা জেলার লাকসাম থানার দৌলতগঞ্জ বাজার। পুস্তক ভবনের মালিক সফিক চৌধুরীর সাথে পরিচয়। একাত্তরে আগরতলায় ও বিলোনীয়ায় ছিলেন কিছুদিন। বিশ্বাস করে ছোটবোন পারভিনের সাথে মিশতে দেন। দুলাল বিশ্বাসযোগ্যতাকে ধর্ষণ করে পারভিনকে নিয়ে মেতে ওঠে। রক্ষণশীল পরিবারের মেয়ে পারভিন দাদার বন্ধু দুলালকে একান্তে পেয়ে কুমারী জীবনের সর্বস্ব শেষ করে দিয়ে নিঃস্ব হয়ে যায়।

নোয়াখালির চৌমুহনীতে রামঠাকুর মন্দিরে অনেকক্ষণ সময় কাটিয়ে সন্ধ্যায় এক মিষ্টির দোকানে দই খেয়ে দুলাল তৃপ্তি পেল। মালিক কাছে এসে জানতে পারেন দুলাল ইণ্ডিয়া থেকে এসেছে। জোর করে বাড়িতে নিয়ে আসেন।

দুলাল তার আন্তরিকতা ও আপ্যায়নের মর্যাদা রাখেনি। এক সপ্তাহ পরে একমাত্র মেয়ে আরতির বিয়ে। বিয়ের আগেরদিন পর্যন্ত থেকে, আরতির জীবন যৌবনকে সে কলুষিত করেছে।

বিমলা, ছন্দা, ফয়জুন্নেছা, গৌরী, সুলতানা আরও অনেকের বোবা কান্না দুলালের কঠোর হৃদয়ে কিছুমাত্র রেখাপাত করতে পারেনি। কুমারীত্ব ও নারীত্বের চরম অবমাননা টের পেয়েও দুলালের কিছুই করতে পারেনি তারা। দাঁতে দাঁত চেপে নিষ্ফল আক্রোশে তাদের সব মেনে নিতে হয়েছে।

কুড়িদিনের পর অর্ঘ্য যখন তাকে নিয়ে ফিরে আসছে তখন তার ভেতরে নেই কোন অনুশোচনা, দুঃখ, ভয় কিংবা অনুতাপ। দুলাল নির্লজ্জের মত রসিয়ে তার কৃতঘ্নতার, বিশ্বাসহীনতার, কুমারীত্ব ও নারীত্বের অবমাননার এবং লাম্পট্যের কথা প্রকাশ করেছে। অর্ঘ্য ঘৃণায় তার চোখে চোখ রাখতে পারেনি।

পরম তৃপ্তি নিয়ে সোনালী ফিরে আসে। সোনালী আধুনিকা, সমঝদার ও সচেতন। অর্ঘ্য তাকে কাছে টেনে নিয়ে সব খুলে বলে। সোনালী মনোযোগ দিয়ে সব শুনেও অবাক হয়নি। তার ধারণা দুলালের জীবনে চরম ভোগের পর পরিবর্তন এসেছে। অর্ঘ্য সেটা মানতে রাজি নয়। মানব চরিত্রে এতবড় পরিবর্তন অসম্ভব।

স্বামীকে আরও কাছে টেনে নিয়ে সোনালী বুঝাতে চায়, 'পুরুষের চোখ দেখে মেয়েরা বুঝতে পারে সে চোখের ভাষা কী। ভাল ভাবে লক্ষ্য করতে হবে, দেখতে হবে তার চাহনি, বুঝতে হবে তার ভাষা। তবেই ধোকা খাওয়ার সম্ভাবনা থাকবে না। তোমার বন্ধুর সত্যিই পরিবর্তন হয়েছে।'

সোনালীকে বুকে টেনে নিয়ে আদর করে অর্ঘ্য জানতে চায়, 'দুলালকে আমি পরীক্ষা করতে চাই। তুমি সহযোগিতা করবে সোনালী?'

'কী বলছো তুমি? আমাকে তুমি এমন করে বলছো কেন? আমি কি তোমার অবাধ্য হয়েছি কখনও? গতকাল সুখ ব্যাপারটা নিয়ে আমার প্রচণ্ডআগ্রহ ছিল। কী সুন্দর বলেছে। তোমাকে নিয়ে শুনলে আমার তৃপ্তিটা পরিপূর্ণ হতো। তুমি না মানলেও আমি বিশ্বাস করি, স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক জন্ম জন্মান্তরের।'

হাসির রেখা ফুটে ওঠে অর্ঘ্যের ঠোঁটে। গতকালের কথা সে আর তুলতে চায়না। সোনালীর কথার পিঠে সে বলে, 'আমি চাইনা জন্ম জন্মান্তরে ....

'চাইবে তুমিও। এক রকম জিনিস রোজদিন ভাল লাগেনা, এই সূত্র তো তোমার? পরের জন্মে আমিই থাকবো, তবে অন্য রূপে, এর পরের বার ভিন্ন রূপে।'

'এক্সিলেণ্ট! ভাল মিলিয়েছ তো!'

পরদিন দুপুরে সোনালী আশ্রমে গিয়ে ওঠে। তার দিকে চেয়ে চোখ ফেরানো কষ্ট। শরীরের রঙের সাথে ম্যাচ করা শাড়ি-ব্লাউজ-টিপ পরেছে। যে কোন দুর্বল হৃদয়ের পুরুষ আক্রান্ত হতে বাধ্য।

তার রূপ, সৌন্দর্য ও যৌবন মিলে যে শক্তি তৈরি হয়েছে, তা একজন সাধারণ ব্রহ্মচারীকে তীব্র আকর্ষণের স্রোতে ভাসিয়ে দেবার পক্ষে যথেষ্ট। তাছাড়া নির্জন দুপুর, শান্ত পরিবেশ, একান্ত আলাপচারিতা ও সমর্পণের ব্যাকুল আকুতি সব মিলিয়ে এক মোহময়ী অবস্থা সৃষ্টি করে সোনালী।

কিন্তু নানাভাবে নিজেকে সমর্পণের ইঙ্গিত দিয়েও সাধু মহারাজের কাছ থেকে কোন সাড়া না পেয়ে কোন দৃশ্যের অবতারণা হলনা। আরো দুঘন্টা নিবেদনের চেষ্টা। বিরক্ত না হয়ে সাধু-ব্রহ্মচারী অত্যন্ত সুন্দরভাবে বুঝিয়ে বলেন, 'মা! আপনি সন্ধ্যায় আসুন। আপনার সব জিজ্ঞাসার উত্তর আমি দিতে চেষ্টা করবো। আমি এখন পুজো দেব, গীতা পড়ব। তারপর নিজের আহারের ব্যবস্থা করবো।'

'আমি কি আপনার কোন কাজে সেবা করতে পারি? আমি আর বাড়ি ফিরে যাবনা, সন্ধ্যায় পাঠ শুনে যাব।'

'আপনার কষ্ট হবে মা! সন্ধ্যার আগে ত অবসর পাবনা আপনার সঙ্গে কথা বলার। আপনার ভাল লাগবেনা। আপনি নাটমন্দিরে থাকতে পারেন। কিন্তু মন্দিরের ভিতরের কোন কাজ আপনাকে দিয়ে হবেনা।'

সাধু ব্রহ্মচারী চলে যাচ্ছেন নিজের নিত্য কাজে। সোনালীর ইঙ্গিতে দূর থেকে অর্ঘ্য এসে হাজির। এসেই কোন ভণিতা না করে অর্ঘ্য তাচ্ছিল্যের সাথে জিজ্ঞাসা করে, 'দুলু আমাকে চিনতে পেরেছিস? আমি অর্ঘ্য।'

পিছন ফিরে ব্রহ্মচারী থমকে দাঁড়িয়ে পড়েন। তারপর কাছে এসে ভালভাবে লক্ষ্য করে একটুও অবাক না হয়ে স্মিত হাস্যে বললেন, 'বসুন।' অর্ঘ্য ব্যঙ্গ করে বলে উঠল, 'এভাবে বলছিস কেন? আমি তোর বন্ধু। আমার সঙ্গে নাটকীয় ঢঙে কথা বলছিস কেনরে শালা? তোর কোন কিছুই আমি ভুলিনি।' আবার হাসি মুখে ব্রহ্মচারী বলেন, 'আপনি আগে বসুন। মা, আপনিও বসবেন।'

'শালা! আমার স্ত্রী সোনালীকে তুই মা বলছিস্? ভড়ং আর কত দেখাবি বল?'

'শুনুন অর্ঘ্য। আপনাকে আমি কেন চিনবনা? অতীতের সব কিছু ভোলা খুব কঠিন। আপনার এক জগত। আর এখন আমার অন্য জগত। দুই জগত সমান্তরালভাবে চলতে পারে, কিন্তু এক হয়ে নয়। প্রত্যেক জগতের কিছু নিয়ম শৃঙ্খলা রয়েছে, তা প্রত্যেক জগতের মানুষকে মেনে চলা উচিত। মা এসেছেন। সন্ধ্যা পর্যন্ত থাকবেন। আমাকে সাহায্য করতে চান ঠাকুরের

পুজোতে। কিন্তু ব্রহ্মচারীর পুজোতে মা-কে তো আমি কাজে লাগাতে পারিনা। তাহলে সমান্তরাল না হয়ে এক সাথে হয়ে অনর্থ হবে।'

'আচ্ছা দুলাল! নারীদের প্রতি তোর তীব্র আসক্তি দূর হল কী করে?'

'আপনার কি এটা জানা খুব প্রয়োজন? মানুষের মনের পরিবর্তন তো হতেই পারে।'

অর্ঘ্য তাকে জব্দ করতে পেরে তৃপ্তি অনুভব করে। সে জোর দিয়ে বলে, 'আমার এটা জানা সত্যি খুব প্রয়োজন। নচেৎ মনের মধ্যে একটা সন্দেহ থেকে যাবে।'

ব্রহ্মচারী একটা জল ভর্তি কাচের গ্লাস ও চিনির পাত্র এনে সোনালীর সামনে দিয়ে বললেন, 'মা, আপনি চামচ দিয়ে চিনি নিয়ে মেশাতে থাকুন যতক্ষণ চিনি শেষ না হয়।'

সোনালী চিনি মেশাতে থাকে। সাধু ব্রহ্মচারী পুজোর আয়োজনে ব্যস্ত। অর্ঘ্য কঠোর হয়ে বসে আছে। দেরি হলেও আজ দুলালকে ছাড়বে না। জবাব তাকে দিতেই হবে।

কিছুক্ষণ পর সাধু ব্রহ্মচারী এসে দেখেন, সোনালী চামচ রেখে দিয়ে বসে আছে। অর্ঘ্য তার প্রশ্নের উত্তরের আশায় আগ্রহ নিয়ে দুলালের দিকে চেয়ে আছে। ব্রহ্মচারী সোনালীকে জিজ্ঞেস করেন, 'কী হল মা? চিনি জলে দিচ্ছেন না কেন?' সোনালী গ্লাস এগিয়ে দিয়ে দেখিয়ে দেয়, চিনি আর মিশছে না। 'এই দেখুননা নিচে পড়ে রয়েছে।'

'কিন্তু কেন এমন হল মা? জলে তো চিনি মেশার কথা!'

'আর কত মিশবে? মিশবার তো একটা ক্ষমতা আছে। আর মিশবে না।'

'মিশবে আরো, এটাকে তাপ দিলে আরও একটু মিশবে, কিন্তু তারপর আর মিশবে না। কেন বলতে পারেন?'

অর্ঘ্য তাচ্ছিল্যের সাথে উত্তর দেয়, 'বিজ্ঞানের ভাষায় এটাকে স্যাচুরেটেড বা সম্পৃক্ত দ্রবণ বলে। চিনি-জলে যে দ্রবণ তৈরি হল এটা সম্পৃক্ত হয়ে গেছে। জলের চিনিকে গলাবার ক্ষমতা শেষ। আরও দিলে পড়ে থাকবে, মিশবে না।'

সাধু ব্রহ্মচারী হাসিমুখে বললেন, 'আমার আসক্তি কামনা এভাবেই শেষ হয়ে গেছে। এতে কোন ম্যাজিক নেই। আশ্চর্য হবারও কোন কারণ নেই।'

সাধু ব্রহ্মচারী তার কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। সোনালী স্বামীর দিকে তাকিয়ে তার মনের ভেতরের অবস্থাটা অনুমান করার চেষ্টা করে। অর্ঘ্য পরম বিস্ময়ে দুলু ওরফে দুলাল চৌধুরী ওরফে সাধু ব্রহ্মচারীর ব্যস্ত ও গমনোদ্যত শরীরের দিকে তাকিয়ে থাকে । সোনালী নির্বাক, বিমূঢ়। অর্ঘ্যের চোখে তার মুগ্ধ দুই চোখ।

ফয়সালা

মেঘের গুরুগম্ভীর ডাকে বুকের জ্বালাটা বাড়ে। কখনও ডাক অধিক বৃষ্টি কম। আবার কখনও ডাক নেই ঝমঝম বৃষ্টি। মানুষ হতবুদ্ধি। প্রস্তুতির অভাবে ভোগান্তির একশেষ। জুলাই মাসের শেষ। এখন পূর্ণ বর্ষার সময়। আকাশের মুখ গোমড়া। চারদিক অন্ধকার হলেও বৃষ্টি নামেনা। নামলে মধুমিতা স্বস্তি পেত। দাউ দাউ করে জ্বলা বুকের আগুন নিভে যেত। পুড়ে যাওয়া ভেতরের জমাট বাঁধা আবর্জনা ধুয়েমুছে সাফ হত। মূর্ছিত সুরঝংকারের মত তার ভেতরটা গুমরে কাঁদে। অসহ্য ব্যথায় তোলপাড়। মানুষের ঢল সর্বত্র। কিন্তু একাকীত্ব তাকে প্রতিনিয়ত কুরে কুরে খায়।

সত্তর সালের কথা। কলেজে ভর্তি হয়ে অন্যদের মত ভেসে বেড়ায়নি মধুমিতা। আত্মীয় বাড়িতে থেকেও সহজ নয়। মায়ের আপন বোন। আন্তরিকতার ঘাটতি নেই। তবুও। নিজের পায়ে দাঁড়াবার চেষ্টায় উদ্‌গ্রীব। আর্থিক সামর্থ্যই মেয়েদের বড় শক্তি। শর্টহ্যান্ড শেখে। অনেক ভেবে সহজ পথটা ধরে। সে মোটেই সুন্দরী নয় । সহপাঠীরা তবুও তার পেছনে ঘুর ঘুর করে। অধিকাংশ ছেলেদের বৈশিষ্ট্যই অমন। মেয়েরা একটু তাকালেই ভাবে প্রেম। হাসলে স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছে যায়। দশ বছর বয়স থেকে এসব বুঝতে শেখে মধুমিতা। নয় থেকে নব্বই বছরের পুরুষ মেয়েদের দেখে লোভাতুর দৃষ্টিতে। তাদের হাত থেকে বাঁচতে সদাসচেতন মেয়েরা।

কল্যাণও প্রথম বছরের ছাত্র। মফঃস্বলের ছেলে। সুন্দর সুগঠিত শরীর। উচ্চতাও ফেলনা নয়। যোগেন্দ্রনগরের দিকে মেস করে থাকে। আর্থিকভাবে ততটা স্বচ্ছল নয়। শান্ত, কথা বলে কম। কিন্তু মধুমিতার জীবনে নিয়ে আসে চরম অকল্যাণ। হঠাৎ মধুমিতার স্টেনোগ্রাফারের অফার। তখন দ্বিতীয় বছরের প্রায় শেষ। প্রথম কয়েক মাস তার নিঃশব্দ অনুসরণ। অফিস থেকে বেরিয়ে দেখে সে দাঁড়িয়ে। রিক্‌সায় ওঠা অবধি পিছু পিছু। উপেক্ষা করে মধুমিতা। কল্যাণের ক্রিয়া তার মনে প্রতিক্রিয়াহীন। নতুন চাকরি। তার মনে দপ্তরের কর্মধারা আর দপ্তরের সহকর্মীদের আচরণ। মাসির বাড়ি ছেড়ে এখন দপ্তরের কাছাকাছি। সাথি সহকর্মী দোয়েল। চৌকস মেয়ে। বাড়ি উদয়পুরের ছনবন।

দিনটা রোববার। দোয়েল বাজার নিয়ে আসে। সঙ্গে কল্যাণ। দোয়েলের সাদর আপ্যায়ন। মধুমিতা নীরব। পীড়াপীড়িতে দায়সারাভাবে সামান্য কথা। কল্যাণও বেশি কথা বলেনা। মাথা নিচু তার। দোয়েল নিজেই সব করে। সে বিরক্ত মধুমিতার ওপর। কলেজের সহপাঠী। চাকরি করছে বলে উপেক্ষা! মধুমিতার ধরাকে সরা জ্ঞান! অত অহংকার! কল্যাণ পরিকল্পনা

করে এগোয়। দোয়েল মধুমিতার অজান্তে। বাজার করে এটা ওটা এনে দেয়। দোয়েল এতেই তৃপ্ত। সামান্য উপকারের প্রতিদানে ব্যাকুল।

মধুমিতার জীবনটা ঘরে বাইরে অতিষ্ঠ। একটা যুবকের নিঃশব্দ অনুসরণ যুবতী হৃদয়ে ঝড় তুলবেই। বিরক্তির শেষ সীমায় একটা হেস্তনেস্ত করবার অভিপ্রায়ে মন তার দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। সেদিন অফিস ছুটির এক ঘন্টা আগেই সে দাঁড়িয়ে। মধুমিতা কাছে এসে কৈফিয়ৎ চায়, 'তুমি পেছনে ঘুরঘুর করছো কেন? কিছু বলার থাকলে বলে ফেল। আমার একদম ভাল লাগেনা। লোকে কী বলবে?' কল্যাণ ওর চোখে একবার দেখে। মাথা নিচু তার। মুখে কিছু বলেনা।

'এখন চুপ কেন? আর কখনও পিছু নেবেনা। আমি অন্য ব্যবস্থা নিতে বাধ্য হব।'

রাগ দেখিয়ে মধুমিতা এগোয়। কল্যাণ এবার নাম ধরেই ডাকে, 'মধুমিতা! আমি বাঁচব না।'

'বাঁচবে না? কী হয়েছে তোমার? ক্যান্সার?'

হেসে ওঠে কল্যাণ। সাহসী হয়ে মধুমিতার চোখে তার চোখ। পাল্টা জবাব দেয়, 'তার চাইতেও বিপজ্জনক। আমি তোমাকে ছাড়া বাঁচব না, মধুমিতা।'

'আমি কি চিকিৎসক? নার্স না ধাত্রী?'

'আমি তোমাকে ভালবাসি।'

'ভালবাসি! অর্থ আমদানীর মুরোদ আছে? অর্থ ছাড়া ভালবাসা হয় না।'

'তোমার অর্থ আছে। আমিও বসে থাকব না।'

'ভালবাসা আমাকে নয়। আমার অর্থে তোমার লোভ হয়েছে, তাই না?'

'অর্থ তো দোয়েলেরও আছে ....'

'এবং সুন্দরীও'

'ভালবাসা অর্থ দিয়ে হয়না। শারীরিক সৌন্দর্য দিয়েও না। হৃদয়ের সৌন্দর্যই বড়। সে জন্যেই তোমাকে ভালবাসি।'

'এ্যাই, কোটেশান মুখস্থ করে এসে আবৃত্তি করবে না। কচি খুকি পেয়েছো? পড়াশোনা ছেড়ে পেছনে ঘুর ঘুর?'

থমথমে মুখে একবার মধুমিতাকে দেখে। তারপর ধীরে ধীরে ফিরে যায়। বুকের ভেতরটা মোচড় দিয়ে ওঠে মধুমিতার। ফিরে এসে সহজ হবার আপ্রাণ চেষ্টা করে। পারে না। তার মনের ভেতর একটা অন্যায় বোধ। বাবাকে মনে পড়ে। ক্রমশ শান্ত হতে থাকে মন। ঈশ্বরে তার বিশ্বাস নেই। রক্তমাংসের লৌকিক পিতাই তার সব। পিতাই তার দেবতা-ঠাকুর-ভগবান। মমতাময়ী মা লালন-পালন করেছেন। চোখ ফুটিয়েছেন বাবা। তার চোখ দিয়েই এ বিশ্বকে সে দেখে। ভয়ে বিপদে মাকে ডাকে। স্মরণে আসে বাবা।

ঘরে দোয়েল তার গুণকীর্তনে ব্যস্ত। বাইরে তার নিঃশব্দ অনুসরণ। দিশেহারা মধুমিতা। তার রক্ষণশীলতা ভেঙে যাবার পথে। অবরুদ্ধ হৃদয় দ্বারে আচমকা ঝড়। যৌবনের হিমেল হাওয়ায় অবসন্ন। যৌবন কী মারাত্মক! কী বেপরোয়া! পাহাড় গুঁড়িয়ে দেবার উদ্যোগ, নক্ষত্র এনে

দেবার প্রতিশ্রুতি, মুক্তোর খোঁজে সমুদ্রে ঝাঁপ — এসব আর অসম্ভব মনে হয়না মধুমিতার। দুঃসহ বিরহে কল্যাণ বাঁচবে না — এই বিশ্বাস তার মনেও গড়ে উঠতে থাকে ।
বন্ধুদের চোখে প্রশ্ন। আত্মীয়রা ঠোঁট ওল্টায়। কৈফিয়ৎ দেয় দোয়েল। অকর্মণ্য, বেকার, ভবঘুরের পেশা ঠিকেদারি। বিয়ের বাজারে মুখ বাঁচে। আগের জমিদার, বর্তমানের ঠিকেদার। সমঝদাররাই গভীরতা খোঁজে।

কল্যাণের ভালবাসার গতি এখনও অব্যাহত। কিন্তু প্রতিশ্রুতি রক্ষায় ব্যর্থ। কলেজের পড়াশোনা অসমাপ্ত। শর্টহ্যান্ড তার কাছে বিরক্তিকর। উদ্যোগহীন সে। বাজার আর ঘুম। একটা পুরুষ এত অকর্মণ্য! মেয়েদের প্রতি তার দুর্বলতা চোখে পড়ার মত। ঘনিষ্ঠ হবার প্রবণতা বেশি। মধুমিতার বুকের ভেতরটায় চিন চিন ব্যথা। উপেক্ষা করার নিরন্তর প্রয়াস।
শহরতলিতে ছবির মত বাড়ি করার পরিকল্পনা মধুমিতার। কল্যাণকে ব্যস্ত রাখার উদ্যোগ। নানাভাবে উৎসাহিত করে। স্বপ্ন দেখায়। রাজধানীর 'কিরণ কমার্শিয়াল'-এ নিজে প্রতি রোববার শর্টহ্যান্ড শেখায়। বাড়তি আয়ের পথ। কল্যাণ এখন ব্যস্ত। ইট, বালি, সিমেন্ট, রাজমিস্ত্রি, হিসেব ইত্যাদি নিয়ে তার ব্যস্ততার অন্ত নেই। এসব দেখে মধুমিতা তৃপ্ত। স্বামীর প্রভাব, প্রতিপত্তি, ব্যস্ততা সব স্ত্রীদের পরম কাঙ্খিত। সেও এর ব্যতিক্রম নয়।

নতুন তৈরি বাড়িতে এসে মধুমিতার স্বস্তিবোধ। কিন্তু হাত কপর্দকহীন। হঠাৎ সত্তর হাজার টাকার জন্যে কল্যাণের চাপ। মধুমিতা অতিষ্ঠ। দুই সন্তান ও শাশুড়ি নিয়ে সংসার। খরচটা নেহাত কম নয়। কল্যাণ এসব মানতে নারাজ। সত্তর হাজার টাকায় 'ওভার এইজ' শিক্ষক পদে নিশ্চিত নিযুক্তি। এ সুবর্ণ সুযোগের স্বপ্নে সে বিভোর। শেষ সম্বল প্রভিডেন্ট ফাণ্ড। চাকরিটা আপাতত স্থায়ী বেতনের। বছর দুয়েক পরেই রেগুলার। পঞ্চাশ হাজার দিতে হয়, সত্তর হাজার নয়। বিশ্বস্ত সুত্রের খবর। কল্যাণের প্রতারণায় মধুমিতার মনটা সন্দিগ্ধ।

কল্যাণের প্রভুত্ব বিস্তার শুরু। স্ত্রীর সঙ্গে পরামর্শ অনাবশ্যক। দুম-দাম জমি কেনে। টাকার ব্যাপারটা মধুমিতার। ওর নিষেধ সত্ত্বেও সে ভ্রূক্ষেপহীন। রাত করে বাড়ি ফেরে। মুখে উগ্র মশলাযুক্ত পান। মদের গন্ধ চাপা দেবার ব্যর্থ প্রয়াস। কর্মস্থল দূরে নয়। তবু বাড়িতে থাকেনা। নানা কথা ভেসে বেড়ায়। মধুমিতার সংশোধনের চেষ্টা অব্যাহত। সাবধান করে। সামাজিক মান সম্মানের কথা তোলে। সে আরও অশান্ত। অশ্লীল তার যুক্তি। এরা সমবয়সী। মেয়েরা ফুরিয়ে যায়। একই বয়সে ছেলেরা সক্ষম। জৈবিক আকাঙ্ক্ষা দমিয়ে রাখা সুস্থতার লক্ষণ নয়। স্তম্ভিত মধুমিতা। সে এখন গেজেটেড অফিসার। কল্যাণের কাছে এসব গুরুত্বহীন। সে তার লক্ষ্যে স্থির। নারীত্বের অবমাননা সহ্য করেও বাহ্যিক সম্মান বাঁচাতে চায় মধুমিতা। সমঝোতার চেষ্টা চালিয়ে যায় । কাতর মিনতি, 'তোমার যা ইচ্ছে করো। কিন্তু আমার অজান্তে। দোহাই তোমার! জীবনে তুমি কিছুই দিতে পারনি। চাইওনি আমি। আমার বাহ্যিক সম্মানটুকু অন্তত নষ্ট করোনা।' সেদিন চোখের জলে প্লাবিত হয়ে আশ্বস্ত করেছে কল্যাণ।

গত রাত দশটায় দূরভাষে ভেসে আসে খবরটা। শুনে মধুমিতা দিশেহারা, বিভ্রান্ত, বিমূঢ়। রাত নিঃশেষ হয়ে দুপুর গড়িয়ে যাচ্ছে, টের পায়নি মধুমিতা। স্তম্ভিত হয়ে শুধু ভাবে। মনের মণিকোঠায় দৃশ্য থেকে দৃশ্যান্তর, অনেক ঘটনা।

বাবার কথা খুব মনে পড়ে। ছোটবেলায় বাবাকে অত্যন্ত কঠোর মনে হত। পড়াশোনার আগ্রহ তার সীমাহীন। চরিত্র গঠনেও সজাগ দৃষ্টি। খুব বকতেন । মারতেনও। বিশেষ করে বোন নন্দিতাকে। পড়ার জন্যে নয়। কথার সঠিক উত্তর না দেবার জন্যে। নন্দুটা আসলে ঘাবড়ে যেত। একটু বড় হতেই আবার বন্ধুর মত ব্যবহার। তাঁর জ্ঞানের পরিধি অত্যন্ত গভীর। শিল্প-সাহিত্য-সঙ্গীতে তার অনুরাগ সীমাহীন। স্বাস্থ্য, চরিত্র, শিষ্টাচারে গভীর সচেতন।

বিয়ের খবর শুনে বাবার সীমাহীন কষ্ট। মধুমিতাকে ডেকে সামান্যই বলেছেন। মেয়েদের জীবনে বিয়েটাই বড় ঘটনা। বড় সিদ্ধান্তটা ভেবে চিন্তে নিতে হয়। পাশ্চাত্য দেশে অবাধ মেলামেশা। কিন্তু বিয়ের কথা উঠলেই সতর্ক হয়ে পড়ে । মদের নেশাও তখন থাকে না । খুব ঠাণ্ডা মাথায় অনেক ভেবে তবেই সিদ্ধান্ত নেয়।

একান্তে মায়ের কাছে তাঁর ক্ষোভ, 'অসম এ বিয়েটা সুস্থির হবার নয়। খাঁটি সোনার মত মেয়ে একটা ভুল সিদ্ধান্তের শিকার। কল্যাণ আজ শান্ত, স্থির। অর্থনৈতিক সুস্থিরতায় প্রকাশ পাবে প্রকৃত রূপ। ক্ষমতা দিয়ে একটা মানুষের প্রকৃত চরিত্র অনুভব করা যায়। ক্ষমতাহীন মানুষ এমনিতেই নির্জীব, শান্ত। তার মন সুযোগের অপেক্ষায় থাকে । এখন কান ধরে শাসানোর বয়স নেই। কেউ মেনেও নেবেনা। তুমিও না। বিস্ফোরণ ঘটবে। মদের নেশায় আচ্ছন্ন মাতালের কাছে ন্যায়-অন্যায় একাকার। যৌবনটাও অমন। উন্মাদনায় ভাল মন্দ এক। মন্দকে ভাল মনে গ্রহণ করে জীবনটা নিঃশেষ। এ পরিস্থিতির জন্যেই মা-বাবারা উতলা। কম বয়সেই ছেলেমেয়ের বিয়ের সিদ্ধান্ত নেয়। আমার বিশ্বাসের গভীরতা ভুল প্রমাণিত। ভবিষ্যতটা আমার চোখে স্পষ্ট। শোধরানোর পথও জানা। কিন্তু আমি অসহায় । কে শুনবে আমার কথা?'

সুস্মিতা স্বামীকে প্রবোধ দেন। শান্ত থাকতে অনুরোধ করেন। অসহায়ের মত কথা। যা হবার হবে। তুমি অত ভেবো না। মেয়ের চাকরি আছে। পথে বসতে হবেনা। করুণ হাসি বাবার মুখে। দুদিকে মাথা নেড়ে কষ্টের বহিঃপ্রকাশ।

আজ বাবা নেই। থাকলে মুখোমুখি হত মধুমিতা। 'তুমি কান ধরে দুটো চড় কষিয়ে দিলেনা কেন? কঠোর হয়ে বাড়ির দরজা বন্ধ করলে না কেন? কেন সম্পর্ক রাখলে অবাধ্য মেয়ের সঙ্গে? তোমার কঠোরতায় আমি বেঁচে যেতাম। আজ আমি প্রাণে বেঁচে থেকেও মনে মরে যাচ্ছি, বাবা! এ যে মৃত্যুর চেয়েও ভয়ংকর যন্ত্রণাদায়ক!'

বাবার বড় ছবিটার সামনে আছড়ে পড়ে সে। কান্নার বিলাপে যেন নিঃশব্দ ঘরের প্রতিটি ইট ভূমিকম্পের মত আন্দোলিত। 'জান বাবা, পাষণ্ডটা কী করেছে? ঊনপঞ্চাশ বছরের কল্যাণ অষ্টাদশী কাজের মেয়েকে বিয়ে করেছে। রেজিষ্ট্রি করে বিয়ে। সরকারি চাকুরে হয়েও। কী

তার দাপট! চারদিকে রসালো আলোচনা। সে তার নববধূকে নিয়ে আসছে। আমি মেনে না নিলে ভয়ানক পরিণতি হবে। এ বাড়ি জমি সব তার নামে লিখে দিতে হবে। বিপদে তোমাকে স্মরণ করছি বাবা! তুমি শেষবারের মত শক্তি দাও। সাহস দাও। আমার প্রেম, বিশ্বাস, আস্থা, মান, ত্যাগ সব পদদলিত। হারাবার আর কী আছে আমার? এর চাইতে বিপজ্জনক পরিণতি আর কী হতে পারে?'

মেঘের গুরুগম্ভীর ডাক বন্ধ। বৃষ্টির পূর্বাভাস। মধুমিতা হঠাৎ ভেতরের জ্বালাটা অনুভব করেনা। তার মনটা এখন কঠিন-কঠোর। কঠোরতম পদক্ষেপ নেবার জন্যে সে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। ঘড়ি দেখে। বাবার ছবিটাও। মুখটা কষ্টের না দুঃখের স্পষ্ট নয়। নন্দুকে সুখী দেখেছেন বাবা। যার ওপর আস্থা ছিল সীমাহীন, সে একটা ভুল সিদ্ধান্তে তলিয়ে গেল অতল সমুদ্রের তলে। সমগ্র পুরুষ জাতটাকে মন্দ ভাবতে পারেনা সে। বাবাও পুরুষ। নন্দুর বরও। বিশেষ করে ওর দপ্তরের ডি ক্যাটাগরির বিনোদ। সারাদিন খাটে। বাড়ি গিয়ে আবার রান্না। ছেলেকে আর পক্ষাঘাতগ্রস্ত স্ত্রীকে খাওয়ায়। তারপর নিজে খায়। স্ত্রীকে সাহস যোগায়। কৃতজ্ঞতায় স্ত্রীর চোখে জল। সযত্নে মুছে দেয়। দপ্তরের মানুষদের কথা বলে ভুলিয়ে রাখে। হাসায়। আর তার স্বামী কল্যাণ? সমাজের নিকৃষ্টতম ঘৃণিত পুরুষ। বেকার ও অকর্মণ্য বলে সে উপেক্ষা করেনি কখনও। স্বামীর প্রকৃত মর্যাদা দিয়ে এসেছে বরাবর। আত্মসম্মানের বিনিময়ে, ওর কিছু অন্যায় কাজেরও প্রতিবাদ না করে, এড়িয়ে গেছে। সমঝোতা করবার আপ্রাণ চেষ্টা করেছে। কিন্তু কল্যাণের বেপরোয়া উদ্যোগ বাড়তেই থাকে। মধুমিতার সহনশীলতাকে দুর্বলতা ভেবে অন্যায়ের চূড়ান্ত শিখরে আরোহণ করেছে। মধুমিতার দীর্ঘসহিষ্ণুতার পরিসমাপ্তি। তার বিষদাঁত চিরতরে ভেঙে দিতে সে আজ বদ্ধ পরিকর।

ক্ষিপ্রগতিতে দূরভাষটা তুলে নেয় মধুমিতা। চিবুক শক্ত করে মুখ খোলে। কথা হয় অনেকক্ষণ। পরম নিশ্চিন্তে দূরভাষটা রাখে। সীমাহীন ধকলের পর চোখে-মুখে কিঞ্চিৎ নির্ভরতার দ্যুতি। এবার শুধু প্রতীক্ষা।

ঝম্‌ঝম্ বৃষ্টি নামে। একটা লাল মারুতি সদর দরজায় ধীরে এসে থামে। আরোহীরা দৌড়ে এসে বারান্দায় আশ্রয় নেয়। সাদা পাজামা-পাঞ্জাবী পরিহিত কল্যাণ পকেটের রুমাল বের করে বৃষ্টি ভেজা মুখটা মুছে এগোতে থাকে। ঠিক সেই মুহূর্তে পুলিশের একটা জিপ দ্রুতগতিতে এসে কল্যাণের পথ আগলে দাঁড়ায়। গভীর আতঙ্কে কল্যাণ ঘরের ভেতর মূর্তির মত দণ্ডায়মান মধুমিতাকে দেখে। আবার পথ আগলে দাঁড়ানো পুলিশকে খুঁটিয়ে লক্ষ্য করে। বধূবেশে তার অষ্টাদশী পরিচারিকা যেন মহাসমুদ্রে হাবুডুবু খাচ্ছে। পুলিশ কল্যাণ ও তার নববধূকে গাড়িতে তুলে নেয়। কল্যাণের মুখে আতঙ্ক দূর হয়ে ফুটে ওঠে হিংস্রতা। মধুমিতা এক ঝটকায় ডান হাত দিয়ে সিঁথির সিঁদুর মুছতেই পেছনের দেয়ালে আঘাত লাগে। ঝন্‌ঝন্ শব্দে ডান হাতের শাঁখা টুকরো টুকরো হয়ে ছিটকে পড়ে মেঝেতে। আকস্মিকতায় মধুমিতার ক্ষণ মুহূর্তের নীরবতা, দ্বিধা। পরক্ষণেই কঠোর হয়ে বাঁ হাতটা ঘরের দেয়ালে আছড়াতে থাকে বারবার।

শূন্য বৃক্ষ

বার বার চিঠিটা পড়ে মণিদীপা বিষণ্ণ, অবসন্ন। প্রতিটি শব্দে বাবার করুণ আর্তি প্রতিফলিত। একমাত্র ছেলে রাজকে নিয়ে তার সব উচ্চাশা আজ বিলীন হবার পথে । অভাবের সংসারে প্রতিনিয়ত বাবার উষ্ণ নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস। খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলা জীবনের গতি স্তব্ধ হবার আশঙ্কায় তিনি অস্থির! বাবার প্রেসের যৎসামান্য আয় থেকে ওরা তিন ভাই-বোন মানুষ। রাজ মণিদীপার দুবছরের ছোট। কলেজের শেষ পরীক্ষার পর ভাল ছেলে পেয়ে মণিদীপা পাত্রস্থ। গত বছর ছোট বোন অনুও। বাবা নিঃস্ব, কপর্দকহীন, ঋণগ্রস্ত।

রাজ অনার্স গ্র্যাজুয়েট। মণির বাড়িতে থেকেই ট্যুইশনি করে। শিক্ষকতার চাকরি তার নিশ্চিত। শুধু সময়ের অপেক্ষা। প্রত্যাশায় দিন গোনে বাবা-মা। সেই ছেলের ঘোষণা, রামকৃষ্ণ মিশনের সন্ন্যাস জীবনই তার লক্ষ্য।

মণিদীপার ভেতরটা তীব্র ঝড়ে উত্তাল। মনের ক্ষোভকে সঙ্গে নিয়েই রাজের ঘরে ঢোকে। ওর চোখ খবরের কাগজে। অত্যন্ত শান্তভাবেই তার জিজ্ঞাসা, 'তুই কি রামকৃষ্ণ মিশনে চলে যাবার কথা বাবাকে বলেছিস, রাজ?'
'হ্যাঁ। বাবার কাছে অনুমতি চেয়েছি।'
'তুই চলে গেলে মা-বাবার কী হবে? ওদের দেখবে কে?'
'যাদের ছেলে নেই তাদের কে দেখে?'
'তাদের জন্য ভগবান আছেন।'
'ঠিক বলেছিস তুই। কিন্তু আমার মা-বাবার দুটি লক্ষ্মী মেয়ে আছে। তুই আমাকে বাধা দিবিনা, মণি। ওখানে গেলেই আমি শান্তি পাব।'

রাজ জানালা দিয়ে দৃষ্টি প্রসারিত করে। মণিকে সে নাম ধরেই ডাকে। কেউ থাকলে, দিদি। নির্নিমেষে কিছুক্ষণ তার চোখ-মুখটা দেখে নিজের ঘরে ফিরে আসে মণি। আবার পড়েবাবার চিঠি। ভয়ে-দুঃখে-ক্ষোভে ভেতরটা তোলপাড়। রাজটা এত স্বার্থপর! বাবার ওপরও তার রাগ। ছোটবেলা থেকেই তার গীতা পড়ার অভ্যেস। এ উদ্যোগ-উৎসাহ বাবারই।

স্কুল থেকে ফেরার পথে বারবার ডাকা সত্বেও মণিদীপার নিঃশব্দতায় মনীষা বিস্মিত। সন্তর্পণে ঘরে ঢুকে দেখে, মণির চোখে জল, হাতে চিঠি। ওর বিস্মিত চোখের সামনে খোলা চিঠিটা এগিয়ে দিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে মণি। গভীর মনোযোগে চিঠিটা পড়ে সে। পরক্ষণেই তার সশব্দ হাসিতে ঘরের নিস্তব্ধতা ভেঙে খান খান। জোর করে মণিকে খাট থেকে নামিয়ে জড়িয়ে ধরে, 'ধেৎ, এতে কান্নার কী আছে? চল্, কোথায় তোর ভাই? দু'জনে একটু কথা

বলে দেখি। আঁৎকে উঠে মণিদীপার বাধা, 'তুই যাবিনা মনীষা। গিয়ে কোন কাজ হবে না। তোর খারাপ লাগবে। কারও কথা শোনেনা সে।'
মণিদীপার মনের অবস্থার পরিবর্তন নেই। নিঃসঙ্গ ঘরে সে একা। স্বামী মফঃস্বলে কর্মরত। সম্ভব নয় প্রতি সপ্তাহে আসা। একমাত্র ছেলে নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশনে। বাড়িতে শুধু সে আর রাজ। দু'জন দু'ঘরে। মনীষা আসে প্রতিদিন। কখনও দু'বারও। অনেক কথা হয় ওদের। মনের খোরাক মেলে। সুস্থতা বোধ করে।

পরদিন স্কুলে যাবার পথে মনীষা এসে দেখে, মণি বিছানায় শুয়ে। স্নান-খাওয়া কিছুই হয়নি তার। জোর-জবরদস্তি করে মনীষা। স্নান খাওয়া সেরে দুই বান্ধবীর বিছানায় গড়াগড়ি। ওর স্কুল যাওয়া বন্ধ আজ। রাজ এসে খাওয়া-দাওয়া করে। বিশ্রাম নেয়। শেষে বেরিয়ে পড়ে ট্যুইশনিতে। একটা কথাও বলে না দিদির সঙ্গে। মনীষা রাজকে আগেও দেখেছে। কথা বলেনি কখনও। মনীষার হঠাৎ গম্ভীর প্রশ্ন, 'আচ্ছা মণি, আমি যদি রাজকে পাল্টাতে পারি তুই কি আমার ওপর খুশি হবি?'
'শুধু আমি কেন, আমার মা-বাবাও কৃতজ্ঞ থাকবে সারা জীবন। তবে তোকে দিয়ে হবে না। এটা আমার নিশ্চিত বিশ্বাস।'
'হলে আমাকে দিয়েই হবে। কারণ নিঃস্বার্থভাবে আর কেউ এগিয়ে আসবে না। সেক্ষেত্রে আমার কয়েকটি শর্ত তোকে মেনে নিতে হবে।'

মনীষার চোখমুখ অন্যরকম। একটা দৃঢ়তার ছাপ। কথাগুলি যেন বহুদূর থেকে ভেসে আসা। মণির দৃষ্টিতে বিস্ময়, এ যেন মনীষা নয়, অন্য কেউ। মণি তার ভাইকে ধরে রেখে মা-বাবাকে বাঁচাতে চায়। চায় তাদের জীবনে সুস্থিরতা, শান্তি এনে দিতে। মনীষার শর্তের পর শর্তে তার দেহ মনে শিহরণ, চমক। দু'ঘন্টা মনের সঙ্গে যুদ্ধ করে সে ক্লান্ত, বিধ্বস্ত। অবশেষে সম্মতি দেয়। পলকহীন দৃষ্টি মনীষার। মণির চোখে চোখ অনেকক্ষণ। হঠাৎ মণিকে জড়িয়ে ধরে মনীষার কান্নার বন্যা। অঝোরে একটানা দীর্ঘক্ষণ। ধীরে ধীরে বাড়ির উদ্দেশ্যে পা বাড়ায়।

চমকে উঠে মনীষার কথা ভাবে মণি। একটা মেয়ের জীবনে সুখী হবার জন্যে যা থাকা প্রয়োজন, তার চেয়ে অনেক বেশি থেকেও মনীষা অসুখী। মনীষার রং ফর্সা, চেহারা কমনীয়, বিন্যাস চমৎকার, স্বভাব নরম, হাতের লেখা সুন্দর, শিক্ষিকা। মেয়েদের যাবতীয় কাজে সে দক্ষ। স্বামী সাধারণ একজন শিক্ষক। তবু এই স্ত্রীকে ফেলে রেখে সে অন্য নারীর কাছে ছুটে যায়, যে মনীষার নখেরও অযোগ্য। মনীষা ঠিকই বলে, সে তাকে স্ত্রী করেছে অর্থ আর ঠিকানার জন্যে। অথচ কলেজের দিনগুলিতে তার চাহিদা ছিল তুঙ্গে।

আজকের ঘটনায় মণির বুকের ভেতর দুঃসহ জ্বালা। মনীষার অত বড় ঝুঁকি কি নারী জীবনের চরম ক্ষতি নয়? নয় আত্মাহুতি? অজানা ভয়ে তার ভেতরটা কাঁপতে থাকে। কাঁদলো কেন?

তার মনে প্রশ্নের পর প্রশ্ন। না, সে পারছে না। কাল এলেই সে নিষেধ করবে। মনীষার যে কোন তুচ্ছ ক্ষতিই তার কাছে অনভিপ্রেত। রাজের জীবনে যা হবার হবে। মা-বাবার ভাগ্যকে মেনে নেওয়া ছাড়া কোন পথ নেই। মনীষার জীবনের বিনিময়ে মা-বাবার স্বার্থকে বড় করে দেখা স্বার্থপরতা।

পরদিনের ডাকেই রামকৃষ্ণ মিশনের চিঠি আসে। মণি দিশেহারা। স্কুলের সময় অতিক্রান্ত। মনীষার দেখা নেই। আশাহত সে। মনে মনে ক্ষোভ প্রকাশ করে, 'এই মেয়ে আনবে রাজের জীবনে পরিবর্তন!'

রাজের ফেরার পনের মিনিট আগেই মনীষা উপস্থিত। তার প্রতি মণির অবাক দৃষ্টি। অত্যন্ত ব্যস্ততায় মনীষার প্রশ্ন, 'রাজ ফিরে এসেছে?' উত্তর দেবার কোন তাগিদ নেই মণির। তার নির্নিমেষ দৃষ্টি এখনও স্থির। মনীষাকে দেখতে দেখতে ধীরে তার মুখে ফুটে ওঠে খুশির আভা। মনীষা পরেছে গাঢ় গোলাপী পাড়ের প্রিন্টেড শাড়ি, সাদা ব্লাউজ। সিঁদুর নয়, লাল টিপ কপালে। সিঁথিতে অস্পষ্ট সিঁদুরের রেখা। হাতে একটা গ্লাস পেপারের ব্যাগ। তাতে ফল ও ফুল। চোখে-মুখে যেন জ্যোতি। সচল প্রতিমার মত।

'ভাইকে ধরে রাখতে গিয়ে তোকে না হারিয়ে ফেলি' — মনীষার চোখে চোখ রেখে মণির কৌতুক। মনীষা নিরুত্তর, প্রতিক্রিয়াহীন। মণি চিঠিটা মনীষার হাতে তুলে দেয়। মনীষা খুলে পড়ে। চিন্তিত মুখটা পরক্ষণেই আবার সহজ-সরল হয়ে যায়। রহস্যময় হাসিতে মণিকে তির্যক দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বলে, 'তোর কথাটা অর্ধ সত্য হতে পারে। আমাকে হারালেও ভাইকে হারাবি না, এটা নিশ্চিত।' এবার প্রসঙ্গান্তরে, 'তোর মনে আছে তো, মণি? রাজের সব চিঠিপত্র তুই আমাকে দিবি। আমি এখন রাজকে নিয়ে আশ্রমে যাব।'
'না খেয়ে কি সে যেতে চাইবে?' বাধা দেয় মনীষা।
'সে দায়িত্ব আমার। আজ আমার জীবনের কঠিনতম দিন। ওর ধৈর্য, কষ্ট-সহিষ্ণুতা, জেদ, রাগ, মানবিকতা, সাহস — সব পরীক্ষা করে দেখব। আজ সে উৎরে গেলে জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত হবে এটা নিশ্চিত।'

কিছুক্ষণ পরেই রাজ এসে ঘরে ঢোকে। মণি নীরবে গিয়ে হাসিমুখে বলে, 'মনীষাকে একটু আশ্রমে নিয়ে যাবি, রাজ?' আকাশ থেকে পড়ে রাজ, 'আমি নিয়ে যাব? রিক্সায় উঠে চলে গেলেই ত হল। সঙ্গে আবার কেউ যাবার কী প্রয়োজন?'
তৈরিই ছিল মনীষা। এগিয়ে গিয়েই রাজের মুখোমুখি।
হাসিমুখে আন্তরিকভাবেই বলে, 'মণিকে নিয়েই যেতাম। কিন্তু সে যেতে পারবে না। আপনার একটু কষ্ট হবে জানি। চলুননা, কতক্ষণ আর। ফিরে খাওয়া-দাওয়া করবেন।'
'আমার দিদিকে ডাকছেন নাম ধরে আর আমাকে আপনি আপনি বলছেন। এ কেমন সৌজন্য?'

'আপনি ত একটু অন্যরকম। আন্তরিকভাবে মেশেন না। সব সময় গম্ভীর, নাম ধরে ডাকবার সাহস পাচ্ছি না।'

'ভরসা করতে পারেন। আমাকে নাম ধরেই ডাকবেন।'

'তাহলে আমাকেও নাম ধরে ডাকবেন।'

'এত বড় মেয়েকে নাম ধরে ডাকা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। সঙ্গতও নয়।'

মনীষা কৃত্রিম রাগে লাল। রাজের একটা হাত ধরে বাইরে এনে বলে, 'চলো, রাস্তায় দাঁড়িয়ে অপরিচিত মানুষকে জিজ্ঞাসা করবো, কে বড়ো? আমি না তুমি? আমাকে বদনাম দিচ্ছো, আমার বয়স বেশি!'

রাজের মুখে হাসি। হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে বলে, 'ঠিক আছে বাবা, আমার ভুল হয়ে গেছে। তুমি কিছু মনে না করলে নাম ধরে ডাকতে আমার আপত্তি থাকবে কেন? তবে মণির, সরি আমার দিদির চাইতে তোমাকে একটু কম বয়েসিই মনে হয়।' মনীষা হাততালি দিয়ে স্বাগত জানায়। এবার কপট বিরক্তি প্রকাশ, 'আর কত দেরি করবে? তুমি কি এ পোশাকেই বেরুবে?'

রাজ তার নিত্য সঙ্গী সাইকেলটা নিয়ে বেরুতেই মনীষার তীব্র প্রতিবাদ। নিঃসঙ্গ রাজ মনীষাকে সঙ্গ দিতেই বেরোয়। রিক্সায় পাশে বসা মনীষা রাজের একটা হাত ধরে বলে, 'না খেয়ে আসাতে তোমার খুব কষ্ট হবে? আমার ওপর রাগ করেছ রাজ?'

রাজ হেসে উড়িয়ে দিয়ে বলে, 'কী যে বলো! ভারতবর্ষে কত লোক না খেয়ে আছে। কত লোক আধপেটা খেয়ে দিন কাটায়। একটা বড় অংশ একবেলা খেয়ে আছে। কেউ ভোরের ট্রেনে এসে অফিস করছে, দুপুরে সামান্য জলখাবার, রাতে ফিরে গিয়ে একটা বেলাই প্রকৃত আহার করছে।'

বাধা দিয়ে মনীষা বলে, 'কী কথার মাঝে কী! শোনো, আমার আজ জন্মদিন। ঠাকুরের কাছে পুজো দেব। ফল-ফুল নিয়ে এসেছি। তুমি দোকান থেকে একটু মিষ্টি নিয়ে এসো।'

রাজের প্রশ্নে উপহাস, 'জন্মদিন? কততম? সরি, মেয়েদের তো আবার বয়সটা জিজ্ঞেস করতে নেই। আমি জানি তুমি আমার দু'বছরের বড়ো।'

'কিন্তু অপরিচিত কেউ দেখলে ভাববে আমি তোমার পাঁচ বছরের ছোট।'

'সুন্দরীদের বয়সটা অনুমান করা কঠিন। সে তো সবারই জানা।'

'তুমি মেনে নিয়েছো তাহলে আমি সত্যিই সুন্দরী? আচ্ছা রাজ, তুমি আমার একটা কথা রাখবে?' রাজের চোখে প্রশ্ন। মুখে কোন শব্দ নেই।

'জন্মদিন উপলক্ষে একটা ট্যাক্সি নিযে শহরের সব আশ্রম ঘুরে কোনাবন আশ্রমে যাব ভেবেছিলাম। তুমি যাবে আমার সঙ্গে? আমি একা যাব কী করে, রাজ?'

'ট্যুইশনি না হয় বন্ধ হবে। পরিচিত-অপরিচিত মানুষজন দেখে কী ভাববে? তোমার কর্তা টের পেলে আমার মাথাটি ফাটিয়ে দেবে।'

'রাজ, আমি তোমাকে একটা কথা বলতে চাই। হাল্কাভাবে নেবে না। তুমি ত সাধু-সন্ন্যাসী হয়ে যাবে। তোমার আর ভাবনা কী? অপরিচিত কেউ দেখে ভাববে স্বামী-স্ত্রী। পরিচিত কেউ তোমাকে-আমাকে সন্দেহ করার কোন কারণ নেই। জীবনে প্রতিষ্ঠিত হতে গেলে এসব লজ্জাকে এড়িয়ে যেতে হয়। শুধু এমন কোন কাজ করবে না, যাতে মাথা নিচু হয় আপনা থেকেই। আমার কর্তা দূরে সরে গেছে। রাজ, আমার খুব কষ্ট। সেসব তোমার শুনে কাজ নেই। তোমাকে আমি কষ্ট দিতে চাই না। আমি তোমার মঙ্গল চাই। এবার তুমি আমার সঙ্গে যাবে কিনা বল।'

'আমি যাব। আমার প্রতিষ্ঠার কোন প্রয়োজন নেই। তবু তোমার কী কষ্ট আমি শুনতে চাই। আমি তোমার সব শুনতে চাই।'

কোনাবন রামকৃষ্ণ আশ্রমে গিয়ে ওরা অভিভূত। মহারাজজীর আন্তরিক আপ্যায়ন অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী। অনেকগুলো অনাথ ছেলে এখানে থেকে পড়াশোনা করছে। আশ্রমের এই বিশাল কর্মকাণ্ড কী কঠোর পরিশ্রমের ফসল, তা ভেবে শ্রদ্ধায় মাথা নত হয়ে আসে। ট্যাক্সি ভাড়াটা রেখে বাকি টাকা মনীষা রাজের হাতে তুলে দেয় প্রণামীর বাক্সে রেখে দেবার নিঃশব্দ ইঙ্গিতে।

এবার ট্যাক্সি দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলে নির্জন অন্ধকার কেটে কেটে। তীব্র বেগে প্রবহমান নির্মল বাতাসে ওদের দেহে-মনে পরম শান্তি, তৃপ্তি। তৃপ্ত শরীরটাকে মনীষা বেশিক্ষণ ধরে রাখতে পারেনা। সারাদিনের ক্লান্তিতে ঢলে পড়ে রাজের কোলে। রাজের মনে কোন অস্বাভাবিকতা নেই। তবু যেন তড়িতাহত। মুহূর্তের জন্যে নিঃসাড়। মনীষার উপুড় হওয়া শরীরটা তার হাঁটুর ওপর। গতির উত্থান পতনে আন্দোলিত। অবিন্যস্ত শরীরের স্পর্শে, প্রস্ফুটিত পদ্মকলির মত অর্ধোন্মুক্ত বক্ষচূড়ার দৃশ্যে তার শরীরটা কেঁপে কেঁপে ওঠে লক্ষ ভোল্টের বিদ্যুৎ চমকের মত। তার জীবনের প্রথম নারী স্পর্শ। এটা কি ভয় না সুখানুভূতি, সে তার বোধের অগম্য। তবে তার নীতি কঠোর মনের দৃঢ়তা যে ভেঙে যাবার উপক্রম এটা তার কাছে স্পষ্ট। দিদির বাড়ির সামনে ট্যাক্সি থামতেই, রাজ মনীষার তুলতুলে শরীরটা তুলে ধরে। ত্রস্ত হয়ে এলোমেলো শাড়ি-ব্লাউজ-কেশ সুবিন্যস্ত করতেই চোখে চোখ। পলকহীন চারটি চোখ স্থির। মুহূর্তে রাজ দরজা খুলে পা রাখে বাড়ির সীমানায়।

প্রতিদিন স্কুলের আগে ও পরে মনীষার আগমন নিশ্চিত। কখনও রাজের ঘরে, কখনও দিদির ঘরে। কখনও ওরা একান্তে, কখনও দিদিসহ ওদের আড্ডা। ধর্ম থেকে রাজনীতি সব। মনীষার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হতে গিয়ে মিশনের সঙ্গে দূরত্বটা বাড়ে। ছুটির দিনগুলি ওদের পিকনিকের মেজাজে কাটে।

হঠাৎ আসে শিক্ষকতার অফার। তীব্র জেদ মনীষার। রাজ-মণি বিস্মিত মনীষার কথায়। এ

চাকরি নিয়ে মফঃস্বলে গেলেই রাজের জীবনটা নিঃশেষ। ভবিষ্যত অন্ধকার। শিক্ষকতার জন্যেই রাজের জন্ম নয়। রাজকে মর্যাদাপূর্ণ পদে নিয়ে যেতে সে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।

মণি মনীষার কাছে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। জোর খাটাবার সাহস নেই। তার কথায় ফুটে ওঠে মিনতি, 'দেখ্ মনীষা, রাজের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের কথা ভেবেই তুই বাধা দিচ্ছিস, কিন্তু বাবার কথাটাও একটু ভেবে দেখ্। হয়ত আর বেশিদিন বাঁচবেও না।'
মনীষার অসহিষ্ণু উত্তর, 'এসব সেন্টিমেন্টের কথা ভাবলে জীবনে কিছুই হয়না। মা-বাবার প্রতি সন্তানের একটা কর্তব্য থাকে। এটা অস্বীকার করছি না। সে জন্যেই রাজ যতদিন না দাঁড়াবে, আমি নিজের জন্যে এক হাজার টাকা রেখে আমার বেতনের বাকি টাকা রাজের হাতে তুলে দেব।'
উপহাসের ভঙ্গিতে মৃদু হেসে মণির প্রশ্ন, 'রাজ তোর টাকা নেবে কেন?'
'আমি রাজকে পছন্দ করি, ভালবাসি।'
বিস্মিত রাজের চোখ-মুখ দেখে তার দ্রুত প্রশ্ন, 'ভালোবাসিস্!'
'হ্যাঁ, রাজ আমার স্বপ্ন, রাজ আমার সাধনা, রাজই আমার জীবনের একমাত্র চ্যালেঞ্জ। আমার পিছু হটার সুযোগ নেই।'

রাজের বুকের ভেতরে একটা ধাক্কা। মণি ক্রোধে জ্বলে ওঠে। পরিস্থিতি সামাল দিতে সে তৈরি। কিন্তু অবস্থাটা অন্যরকম। ক্রোধ নয়। অভিমান মণির। মনীষার সব শর্ত মেনে নিয়েছে মণি। এখন কঠোরভাবে বলবার সুযোগ কোথায়? নরম হয়ে বলল, 'আমার কর্তাকে কী কৈফিয়ৎ দেব তুই বলে দে।' চিন্তিত মনীষা। পথ দেখিয়ে দেয় মণিই।
'আমার বক্তব্য হচ্ছে, অফারটা বাতিল না করে কাজে যোগ দিক। তারপর ভেবে-চিন্তে কাজ করা যাবে। পড়াশোনাও চলবে। তোর কথা মেনে টি. সি. এস. দিচ্ছেই। পাশ নাও করতে পারে। এব্যাপারে গ্যারান্টি দেয়া যায়না। পাশ করেও অরাল-এ অনেকেই বাদ পড়ে।'
'পাশ ওকে করতেই হবে। অরাল-এর দায়িত্ব আমার। সে চিন্তা ওকে করতে হবেনা।' কথাটা কঠোরভাবে বলেই মনীষার চোখে-মুখে গভীর প্রত্যয় ফুটে ওঠে।

মনীষার সাথে রাজের মেলামেশা ক্রমশ সীমিত। টি. সি. এস.-এর জোর প্রস্তুতি। পাশ না করলে মনীষার সান্নিধ্য বন্ধ চিরতরে। নিজেকে গুটিয়ে নেয় সে। এ ব্যাপারে তার ভূমিকা কঠিন-কঠোর। রাজের পরম কাঙ্ক্ষিত টি. সি. এস. নয়, মনীষার উষ্ণ সান্নিধ্য। সপ্তাহে চারদিন মনীষার সান্নিধ্যহীন মফঃস্বল তার কাছে অভিশাপ। মনীষা ছাড়া তার জীবন অর্থহীন। রসহীন শুষ্ক মরুভূমি। তার কঠোর পরিশ্রম মনীষাকে খুশি করার জন্যেই।

টি. সি. এস.-এর ফল বেরুবার সাথে সাথেই মণির বাড়িতে খুশির বন্যা। অপ্রত্যাশিত রেজাল্ট রাজের। খুশিতে রাজ উদ্দাম। জোর করে মনীষাকে নিয়ে উধাও। মণির বুকে ভারী দীর্ঘশ্বাস। নির্বিকার থাকার প্রাণপণ চেষ্টা।

সন্ধ্যার একটু পরেই রাজ মনীষাকে এগিয়ে দিয়ে আসে। ফিরে এসেই তার মনে অভূতপূর্ব পরিবর্তন। সারাটাদিন কেটেছে হইচই-এ। মনীষা ফিরে যেতেই বিষাদের অনুভূতি। ভেতরে একটা অপূর্ণতার অসন্তুষ্টি। মনীষার উপস্থিতিতে বিষাদময় অনুভূতিটা জাগেনা কেন? বরাবর নারী সান্নিধ্য এড়িয়েই সে পদার্থবিদ্যায় সাম্মানিক স্নাতক। বাবার দৌলতে তার জীবনটা ছোটবেলা থেকেই সুশৃঙ্খল। নারী পুরুষের মিলন তার কাছে এক বর্বর প্রথা। আরও গভীরে গিয়ে অন্য বিশ্লেষণ। সৃষ্টির ধারাকে অব্যাহত রাখবার জন্যেই হয়তো বর্বর প্রথাটাকে নানাভাবে সুষমামণ্ডিত করেছে সমাজপতিরা।

তার পছন্দ আধ্যাত্মিক জীবন। রামকৃষ্ণ মিশনের সন্ন্যাসীদের সুশৃঙ্খল আধ্যাত্মিক জীবনে সে বিশেষভাবে আকৃষ্ট। সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বরের নিরবচ্ছিন্ন আরাধনায় সে যথেষ্ট এগিয়েছিল। হঠাৎ একটা ছোট্ট ঘটনায় সব ওলট-পালট। মনীষার সান্নিধ্যে সে অতটা উতলা কেন? সে কি গভীর খাদে নিমজ্জিত? না শান্তির আকাশে উড়ন্ত বিহঙ্গ, সঠিক বুঝতে পারে না। আধ্যাত্মিক পথের যাত্রা কি সঠিক ছিলনা? জোর করে গেলে নির্ঘাৎ পদস্খলন। তার পরিণতি বিপজ্জনক। শিউরে ওঠে সে। ঈশ্বরের শরণাপন্ন হয় মনে মনে।

হঠাৎ তার অন্য অনুভূতি। বিবাহিত হয়েও ঈশ্বরের আরাধনায় বাধা কোথায়? রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব নিজেও ছিলেন বিবাহিত। নিজের অজান্তেই জিভ কাটে দাঁত। পরমহংসের তো তার মত উতলা ভাব ছিলনা। সে কি পাপ করছে? মনে মনে বিদ্রোহী হয়ে ভাবে, কিসের পাপ? সে ত কোন অন্যায় করছে না। মনীষাকে সে বিয়ে করবেই। মনীষা তার জীবনে একমাত্র হলেও শ্রেষ্ঠা। অনবদ্য ও অসাধারণ। মনীষার জন্যে সে সব ত্যাগ করতে পারে। বিদ্যা, বুদ্ধি, রূপ, গুণ ও ব্যবহারে সে অতুলনীয়া নারী। মস্তিষ্কের স্তরে স্তরে মনীষার স্মৃতি। এ সম্পর্ক গড়ে না উঠলে তার জীবন বৃথা হত। দীর্ঘশ্বাস অন্তস্থ করে তার ভাব প্রকাশ এমন পর্যায়ে আসে, ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকে রাজ। কতোয়ালী থানার চারটে ঢং ঢং শব্দ শুনে কান্না বন্ধ করে বিস্মিত সে। নিদ্রাহীন পুরো রাতটা শেষ!

হেমন্তের অপরাহ্ন। শীতের আগমন বার্তা স্পষ্ট। সিপাহীজলার এ সময়ের পরিবেশ ভাবগম্ভীর। পিকনিক স্পটের পশ্চিম কোণে একটু দূরে একটা বিশাল শাল বৃক্ষ। বৃক্ষের নিচে একটা চাদর পেতে বসে ওরা। শুধু পাশাপাশি নয়, ঘেঁষাঘেঁষি করেই। বিরক্তি প্রকাশ করে মনীষা, 'অমন ঝড়ের মত আমাকে নিয়ে এলে কেন? মণিকেও নিয়ে আসতে পারতে।'

'আমি তোমাকে একটা কথা বলার জন্যেই নিরালায় নিয়ে এসেছি। আমি তোমার কাছে কৃতজ্ঞ মনীষা।'

'সে ত জানিই। এ কথাটা বলার জন্যে এতদূর নিয়ে এলে? বোকা ছেলে!'

দাঁতে দাঁত চেপে রাজের দৃঢ় ঘোষণা, 'আমি তোমাকে বিয়ে করতে চাই।'

মনীষার চোখ বিস্ফারিত। পাকা আপেলের মত মুখের রং হঠাৎ শ্বেত-শুভ্র। তারপর ক্রোধে জ্বলে ওঠে, 'হোয়াট! কী বল্লে তুমি? তোমার মাথা ঠিক আছে তো?'

'আমি তোমাকে ছাড়া বাঁচবো না মনীষা।'

'রাজ, আমি তোমার চেয়ে বয়সে বড়। আমি ব্রাহ্মণ। আমার স্বামী আমাকে এখনও ডিভোর্স দেয়নি। আমি তোমাকে বিয়ে করতে যাবো কোন দুঃখে?'

'ভালবাসার জোর আর শুদ্ধতা থাকলে দু'বছরের পার্থক্য, ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণ এ সবে কিছু যায় আসেনা। স্বামীর কাছ থেকে তুমি অনেক বছর আলাদা রয়েছো। মেয়েরা ডিভোর্স চাইলেই পেয়ে যায়।'

'যা অসম্ভব তা করতে যেওনা। তুমি এখনও ছেলেমানুষ। তোমার মনটা পবিত্র। জীবন সম্পর্কে তোমার অভিজ্ঞতা কম। তুমি অনেক বড় হবে। আমার মত ঠোক্কর খাওয়া অবহেলিত একটা মেয়েকে বিয়ে করতে যাবে কেন? ভাবাটাও তোমার অন্যায়। সমাজে তোমার মর্যাদা কমে যাবে। আমি তোমাকে অনেক বড়ো দেখতে চাই, রাজ। তোমার পায়ে তখন সুন্দরীরা হুমড়ি খেয়ে পড়বে। অসাধারণ রূপবতী-গুণবতীই তোমাকে এনে দেব। তখন কিন্তু আমার পায়ে ধরে তোমাদের দু'জনকেই প্রণাম করতে হবে।'

ক্রোধে রাজের চোখ-মুখ রক্তবর্ণ। তীব্র তেজ প্রকাশ করে বলে, 'তুমি তোমার ব্রাহ্মণত্ব নিয়ে থাকো। আমি প্রতিজ্ঞা করছি, তুমি রাজি না হলে আমি অরাল ফেস্ করব না। প্রয়োজন নেই আমার প্রশাসনিক অফিসার হওয়ার।'

মনীষার অপ্রত্যাশিত পরিবর্তন। কোমল বাহুযুগলে রাজকে জড়িয়ে ধরে শান্ত করে। আদরে আদরে দ্রবীভূত তার সব ক্রোধ। শান্তভাবেই বলে, 'আগে প্রশাসনিক অফিসার হয়ে জয়েন কর। অত উতলা হচ্ছো কেন? আমি তো আর পালিয়ে যাচ্ছি না।'

নিমেষে অভাবনীয় ঘটনা। রুমাল দিয়ে রাজ মনীষার কপাল আর সিঁথির সিঁদুর মুছে দেয়। ঘড়ির স্টিল চেইনের আঘাতে হাতের শাঁখাদুটি ভেঙে টুকরো-টুকরো। পকেট থেকে সুদৃশ্য দামী সিঁদুরের কৌটো খুলে কপাল আর সিঁথিতে এঁকে দেয় রক্ত লাল সিঁদুর। দু'হাতে পরিয়ে দেয় দুটি নতুন শাঁখা।

অভাবনীয় এ ঘটনায় অপ্রস্তুত মনীষা। মুহূর্ত মাত্র। নিমেষে শাল বৃক্ষে মাথা ঘষে কান্নায় ভেঙে পড়ে। রাজ মনীষার ফুলে ফুলে ওঠা শরীরটা টেনে এনে নিজের বুকে পিষতে থাকে। এক সময় সেও মনীষার বুকে আছড়ে পড়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকে।

পরম যত্নে মনীষা ছোট তোয়ালে দিয়ে রাজের সিঁদুর মাখা আঙুলগুলো মুছে দেয়। শাড়ির আঁচলে দু'চোখ। তার হাত ধরে সিপাহীজলার দর্শনীয় স্থান থেকে স্থানান্তর। দিনের বিদায়ের ক্ষণটিতে ওরা ট্যাক্সিতে ওঠে। গতিশীল হতেই মনীষা রাজের মাথাটা নিজের ভারী বুকে চেপে ধরে। দুজনেই নিঃশব্দ, নির্বাক। রাজের ঘন চুলে ওর শুভ্র আঙুল নীরবে গতিশীল। অপ্রত্যাশিত অনুরাগে ওর ভেতরে গভীর প্রশান্তি।

চাকরি ছাড়াও কম সমস্যা নয়। কাগজপত্র যথাযথ তৈরি করতে সে অতিষ্ঠ। তিন দিন পরেই

বহিঃরাজ্যে প্রশাসনিক প্রশিক্ষণ শুরু। যাবার আগের দিন মনীষার সাথে ঘোরাঘুরির সিদ্ধান্ত নেয়। কিন্তু রিলিজ অর্ডারে পদবিটা যে ঠিক নেই ! আবার দৌড়াদৌড়ি। পুরো দিনটা নিঃশেষ। সন্ধ্যায় নির্বাচিত প্রার্থীদের 'গেট টুগেদার'। ফিরতে রাত নয়টা, মনীষা অপেক্ষা করে একটু আগে ফিরে গেছে। রাগে, বিরক্তিতে, নিষ্ফল আক্রোশে রাজ উত্তপ্ত। পরদিন এয়ারপোর্টে মনীষা সবার আগেই আসে। দুর্ভাগ্য রাজের। জামাইবাবুর আদরে-সান্নিধ্যে রাজ বিরক্ত। সর্বক্ষণ রাজের শরীরে যেন লেপ্টে রয়েছেন। শ্যালকের গর্বে তিনি গর্বিত। মণি আর মনীষা মুখ টিপে হাসে। রাজের দৃষ্টি এড়িয়ে হাসতে গিয়ে ওদের চোখ-মুখ ফুলে ওঠে।

প্রশিক্ষণ শেষে রাজ অন্য মানুষ। রাগ-তেজ দ্রবীভূত হয়ে মাটির কাছাকাছি। প্লেন থেকে নেমে সবাইকে দেখে। কিন্তু দু'চোখ খুঁজে বেড়ায় অন্য কাউকে। মণি এক ফাঁকে তথ্যটা দেয়, মনীষা অসুস্থ। মানসিক ব্যাপার। রাজের ভেতরটা দুমড়ে-মুচড়ে একাকার।

রাজের ব্যস্ততার সীমা-পরিসীমা নেই। জয়েন করেই তার মোহভঙ্গ। বাইরে থেকে যতই লোভনীয় পদ মনে হোক, বাস্তবে ঝামেলার ডিপো। এরাই বোধহয় সরকারের প্রকৃত গোলাম। প্রতি মুহূর্তে কৈফিয়তের ভয়। তোমার অঞ্চল শান্তিপূর্ণ রাখার দায়িত্ব তোমারই। জেদ, নীতি, মানবিকতা শব্দগুলো ভুলে যাওয়াই মঙ্গল। প্রয়োজনে পঞ্চায়েত সদস্যের কাছেও ছুটে যেতে হবে।

মনীষার সাথে এখনও সাক্ষাত ঘটেনি রাজের। বাড়ি গিয়ে আজ দেখা করতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ রাজ। মণির প্রাণপণ বাধা। মনীষার বাবার অপমানজনক প্রশ্ন, মনীষার সঙ্গে রাজের সম্পর্কটা কী? মনীষা নীরব, নির্বাক। কোন আপ্যায়ন নেই। যেন সম্পূর্ণ অপরিচিতা। রাজ ঘাবড়ে যায়। প্রেসের লোকেরা টের পেলে মুখরোচক সংবাদ কাগজে ভরে উঠবে। তার অদম্য আকাঙ্ক্ষার অপমৃত্যু। ভেতরটা ধিকিধিকি জ্বলে।

সংগোপনে সাক্ষাৎ করার বারবার উদ্যোগ নেয়। স্কুলের পাশে, রাজপথে, বাড়ির সামনে দূরে অপেক্ষায় থাকে। মনীষার হাল্কা দৃষ্টি। ফ্যাল ফ্যাল করে তাকায়। চিনতে পারেনা। রিক্সা থামিয়েও বিফল। একবার রিক্সা থামাতেই কঠোর কথা রিক্সা চালককে। ভয়ে কেঁপে ওঠে রাজের ভেতরটা। অসহ্য কষ্ট আর দুঃসহ জ্বালায় ছুটে যায় সিপাহীজলার সেই শাল বৃক্ষের পদতলে। বার বার অসংখ্য বার। আনন্দে-দুঃখে, জয়-পরাজয়ে।

গতিময় যুগে সবক্ষেত্রেই দ্রুত পরিবর্তন। রাজেরও। চুলের রঙেও শুভ্রতার আনাগোনা। ছেলে মেডিকেল কলেজে। মেয়ে ইংরেজিতে অনার্স নিয়ে সদ্য স্নাতক।

জাদরেল অফিসার হিসাবে সুখ্যাতি সর্বত্র। দিন কয়েকের মধ্যে আই.এ.এস. হবার নিশ্চিত

সম্ভাবনা। মেয়ে ও স্ত্রী টান টান উত্তেজনায়। ছেলে রাজস্থান থেকে খবরের প্রত্যাশায়। রাজ নির্বিকার, সহজ স্বাভাবিক। জীবনের কোন ঘটনায় সে আর উৎসাহ বোধ করে না।

সকাল এগারটা নাগাদ বাড়ির দূরভাষ দুটি প্রতি দশ সেকেণ্ড অন্তর বেজে চলে। মা-মেয়ে আনন্দে দিশেহারা। পনের মিনিট ধরে অবিরাম উদ্যোগে বাবাকে পেয়ে যায় মেয়ে। দূরভাষেই চিৎকার করে, 'পাপা, তুমি আমাদের জানাওনি কেন? এক্ষুণি চলে এস তুমি। ইট ইজ টু মাচ রিয়েলি, পাপা।'
'চুমকি শোন, আমার একটু দেরি হবে। অন্য জায়গায় আমাকে একটু যেতে হবে।'
দূরভাষেই কেঁদে ফেলে চুমকি, 'আমাকে তোমার নিয়ে যেতে হবে সেখানে। তা নাহলে এখন থেকে কিছুই মুখে দেবনা। রাতে পিসিমণির বাড়ি চলে যাবো।'
'আচ্ছা, আচ্ছা। ঠিক আছে, তুই তৈরি হয়ে থাক।'

গাড়ি এল, কিন্তু রাজ এল না। চুমকি সেক্রেটারিয়েটে বাবার রুমে ঢুকেই দরজাটা বন্ধ করে বলে, 'পাপা! তুমি কোথায় যাও? কার সঙ্গে প্রায়ই দেখা করতে যাও? আমাদের চাইতে আপনজন তোমার কে আছে, পাপা? আমি বড় হয়েছি। মামণি কাছে নেই। তোমার কিসের ভয়? তোমাকে আমরা তো কেউ কখনও কষ্ট দেইনি। মামণিও না। তোমার কী কষ্ট পাপা? যেবার তুমি গ্রেড ওয়ান হলে, আমরা সবাই মিলে আনন্দ করছি। তোমাকে ছাদে খুঁজতে গিয়ে দেখি, তুমি নেই। নামতে গিয়ে ভেন্টিলেটারের ফাঁক দিয়ে বন্ধ ঘরে চোখ পড়ে, তুমি কাঁদছ। ভয় পেয়ে দরজায় জোরে ধাক্কা দিতেই তুমি খুলে দিলে। আমাকে জড়িয়ে ধরে আদর আর আদর। একদিন চুপিচুপি মামণিকে বলেছি। মামণির বক্তব্যও সাদামাটা, 'অনেকে আনন্দে কাঁদে। হয়ত মা-বাবার কথা মনে হয়েছে কিংবা আগের কষ্টের কথা মনে হতে পারে।'

এক নিঃশ্বাসে এতগুলি কথা বলে চুমকি কাঁদতে থাকে। ছোট বালিকার মত তীব্র জেদ। রাজ হেসে উড়িয়ে দেয়। কষ্ট করে হেসে বলে, 'যাবি তাহলে তুই? দেরি হবে কিন্তু। মামণিকে বলে এসেছিস তো?'
'তুমি রিং করে জানিয়ে দাও।'
'আগে আমাকে সেখানে যেতে হবে। তারপর তোর মামণির সঙ্গে দেখা করব।'

চুমকি বিস্মিত বাবার কথায়। রিসিভারটা তুলে মাকে জানিয়ে দেয়। এবার ঘটনাটা বলার জন্যে বাবাকে ধরে। রাজ যেতে যেতে বলে, 'চল্, গাড়িতে বসেই সব শুনবি। তীব্র গতি গাড়ির। গাড়ির সামনে লালবাতি। সামনে পেছনে আরও দুটি গাড়ি। চুমকির খুব ভালো লাগে। বাবার জন্যে তার খুব গর্ব। বাবার অনেক গুণ। অমন বাবা খুব কম মানুষের হয়। রাজ ধীরে ধীরে মনীষার কথা খুলে বলে। তার দুচোখে জলের ধারা। সব কথা শুনে চুমকি চোখ মুছে দেয়। কাঁধে মাথা রেখে সান্ত্বনা দেয়, 'তুমিতো কোন ভুল করোনি, পাপা। সিপাহীজলা এলে কেন?'

‘এই শালগাছটার নীচে মনীষাকে সিঁদুর পরিয়ে দিয়েছিলাম।’

‘উনি কি রেগে গিয়েছিলেন?’

‘না। একটু কেঁদেছে। পরে আমরা অনেক ঘুরেছি। গাড়িতে আমার মাথাটা টেনে নিয়ে ....’

‘তুমি জয়েন করার পর আর কোথাও ওনাকে নিয়ে গেছ?’

‘না। এর পর থেকে ওর দেখাই পেলাম না। রাস্তায় দেখা করতে গিয়ে কোন লাভ হয়নি। চিনতেই পারেনা।’

‘মানসিক রোগের কথা কে বলেছে তোমাকে?’

‘তোর পিসিমণি।’

হঠাৎ চুমকি চিৎকার করে কেঁদে ফেলে, ‘পাপা! তুমি কী বোকা! তোমাকে ওরা দুজনে মিলে ঠকিয়েছে। পিসিমণি সব জানে। ম্যাডামের স্কুলটা কোথায়?’

‘তোর পিসিমণির বাড়ির পাশেই।’

‘পাপা, এক মিনিটও সময় নষ্ট না করে এক্ষুণি চলো। স্কুল ছুটির আগেই পৌছতে হবে। পিসিমণিকে আজ আমি ছাড়বো না।’

গাড়ির গতি অত্যন্ত দ্রুত। স্কুল ছুটির আগেই ওরা পৌছয়। চুমকির চাপে মণির ভেতরে ভাবনার পাহাড়। মনীষাকে আনতে যাবে কি যাবেনা, সঠিক সিদ্ধান্তে আসতে পারেনা। রাজের প্রতিভা ছিল। কিন্তু রাজের এই প্রতিষ্ঠার পেছনে মনীষার এই উদ্যোগ অনুঘটকের কাজ করেছে নিঃসন্দেহে। বিনিময়ে সে কিছুই পেলনা। পাবার কথাও ছিলনা। উভয়ের মর্যাদার কথা ভেবেই এতগুলি বছর অত্যন্ত সতর্কতায় তীক্ষ্ণ বুদ্ধি খাটিয়ে দুজনকেই বিচ্ছিন্ন রেখেছে। সম্মানের কথা ভাবলে সমাজকে উপেক্ষা করা যায়না। সে কোন অন্যায় কিংবা ভুল করেছে, মনে হয়না। কিন্তু সব ছাপিয়ে একটা অনুভূতি মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। সে কি স্বার্থপরতা করেছে? কেবল ভাইয়ের কথা ভেবে মনীষার সর্বনাশ করেছে? মনীষা তো যন্ত্র-মানবী নয়! রক্ত-মাংসের বাঁধনের ভেতর কি লুকিয়ে রয়েছে অন্য কিছু? ক্ষোভ, অনুযোগ, অতৃপ্তি ? কখনও ওর আচরণে প্রকাশ পায়নি। আজ হঠাৎ খুঁচিয়ে তোলা সঙ্গত হবে কি? মনে কেনই বা দ্বিধা? এটা কি একটা অঘটনের পূর্বাভাষ, না আনন্দঘন মুহূর্তের পূর্বসূচনা? তনুমন তার সায় দেয় না। চুমকির চাপে মনীষাকে আনতে যেতে বাধ্য হয়।

দুই বান্ধবী হাসতে হাসতে আসছে। কে বলবে মনীষা মানসিক রোগী? সদর দরজায় এসে মনীষা থমকে দাঁড়ায়। লাল বাতিওয়ালা গাড়ি, এসকর্ট ইত্যাদি। মণি জোর করে নিয়ে ঢোকে। মনীষার চোখ কী যেন খুঁজে বেড়ায়। বাড়িটার অনেক পরিবর্তন। রাজের ঘরটা এখন দালানঘর। বারান্দায় উঠেই মনীষার শরীরে বিদ্যুৎ চমক। ভেতরে রাজ আর চুমকিকে

দেখে পিছিয়ে যায়। মণি ওর হাত ধরে বলে, 'আজ আমি বা রাজ নয়, চুমকি এসেছে। সে সব জেনেছে, মনীষা।'

চুমকি এগিয়ে এসে জিজ্ঞেস করে, 'ম্যাডাম, আমাকে চিনতে পারছেন? সঙ্গীতে আর অঙ্কনে প্রাইজ পেলে আমাকে আদর করেছেন।'

'না।'

'পাপাকে চিনতে পারছেন? আপনার রাজ!'

'না।'

'শুধু না আর না। পাপা তোমাকে আমি অনেকবার বলেছি, আমাকে এক ম্যাডাম জড়িয়ে ধরে অনেক আদর করেন। একবার নয়, যতবার প্রাইজ পেয়েছি ততোবার। তুমি গুরুত্ব দাওনি। শুধু বলতে, প্রাইজ পেলে সব ম্যাডামই আদর করে। আজ উনি আমাকে চিনতে পারছেন না। পিসিমণিও বলছে না কিছু।'

'চুমকি, আমি অসহায়, মা। আমাকে ভুল বুঝিস না।'

মনীষা ফিরে যেতে উদ্যত হতেই চুমকি কেঁদে ডেকে ওঠে, 'বড় মা!'

হঠাৎ মনীষা তড়িতাহতের মত ছট্‌ফট্‌ করে। মুহূর্তে স্বাভাবিকতা ফিরে পেয়ে কঠোর হয়ে ওঠে। ঘাড়ের সমান্তরালে বারবার মাথা দুলিয়ে নির্বাক মনীষা। চুমকি এবার চিৎকার করে কাঁদতে কাঁদতে বলে, 'বড়মা! তোমার রাজের খুব কষ্ট। প্রমোশন পেয়ে কাঁদে। সেই শাল গাছটার কাছে ছুটে যায়। সুখের ঘটনায়ও খুশি হয়না। আমার পাপাকে ভাল করে দাও বড়মা! একবার জড়িয়ে ধরে আদর করে দাও। পাপা ভাল হয়ে যাবে। তোমার রাজ তোমাকে খুব ভালবাসে। তত ভালবাসা আমাদের কাউকে নয়। তোমার নামের সঙ্গে মিলিয়েই আমার নাম মনস্বিতা।'

মনীষা রাজের চোখে চোখ রাখে। অনেক অ-নে-ক বছর পর। পুরো বাড়িটায় মুহূর্তের পর মুহূর্ত নিঃস্তব্ধতা। মনীষার মস্তিষ্কে দাবানলের আগুন দাউ দাউ করে জ্বলছে। বুকের ভেতরটা ভূমিকম্পে তছনছ। আর একটা স্ট্রোক হলে সে বেঁচে যেত। প্রণয়ের অভিনয় করে সামনের পুরুষটিকে সংসারমুখী করবার লক্ষ্যে তার নিজের সংসারটাই শেষ হয়ে গেল। রাজের সঙ্গে মেলামেশার কয়েকদিন পরই স্বামীর সমঝোতার প্রস্তাব। রাজের কথা ভেবেই প্রত্যাখ্যান। মাঝপথে ছেড়ে দিলে দিশেহারা হয়ে নিঃশেষ হয়ে যেত। কঠোর হয়ে স্বামীর ডিভোর্সের মামলা। বিতর্ক এড়াতেই সহজে সে ডিভোর্স মেনে নেয়। মণির মা-বাবা-ভাই-বোন কেউ ওর পরিচিত নয়। বান্ধবী মণিকে সুস্থিরতা দেবার লক্ষ্যেই সে রাজের দায়িত্ব নেয়। নিজের জীবন-যৌবন ও সুখ-শান্তির বিনিময়ে। অধ্যাত্মমুখী রাজ তাকে অতটা উতলা করবে, সে ভাবতে পারেনি। রাজকে সে সংসারের পথে রেখেছে, কিন্তু নিজে হারিয়ে ফেলেছে পথ। রাজ তার শরীরের কোষে কোষে। অসহ্য মর্মবেদনায় বাইশটি বছরের প্রতিটি মুহূর্ত রাজের কথা ভেবে অতিক্রান্ত। পুরুষ হয়ে রাজ অনুভব করতে না পারে, কিন্তু মেয়ে হয়ে মণির

বোধের অগম্য, তা বিশ্বাস করা যায় না । অসুস্থতার দোহাই দিয়ে ভাইকে সঠিক পথে রেখে জীবনে উত্তরণের স্তরগুলি অতিক্রম করবার পথ সুগম করেছে। অথচ একই শহরে থেকে যার উদ্যোগে একটার পর একটা স্তর পেরিয়ে গেল, সে-ই উপেক্ষিতা! প্রতিশ্রুতি কি মানবিকতার উর্ধ্বে ? আজ ভাইয়ের সামনে তাকে উপস্থাপন নিষ্কণ্টক ভেবেই। এখন হারাবার কিছু নেই। প্রতিশ্রুতি কি এই স্বার্থপরতাব চেয়েও নীচ ? মণির অজানা কিছুই নেই। পাবলিক সার্ভিস কমিশনে মনীষার বড় মামা রয়েছেন। দক্ষিণের একটা ব্লকে কর্মরত অবস্থায় রাজের বিরুদ্ধে উত্তাল সমগ্র অঞ্চল। রাতারাতি রাজের কর্মস্থল পরিবর্তন রাজধানীতে। হাঁফ ছেড়ে বাঁচে সে। কিন্তু মণি একবারও ভাইয়ের সঙ্গে তাকে মিলিত হবার সুযোগ দেয়নি। সেই প্রথম ষ্ট্রোক মনীষার। রাজের বিয়ের সংবাদ কাগজে পড়ে দ্বিতীয় ষ্ট্রোক।

রক্ত মাংসের রাজকে চিরতরে হারিয়ে সে বেঁচে আছে। রাজ তার সমগ্র হৃদয় জুড়ে, মস্তিষ্কে র স্তরে স্তরে, স্বপ্নের স্বর্গপুরীতে। এই রাজ সেই রাজ নয়, ক্রোধী বালকের মত যে জেদ করেছিল ....।

মনীষার শূন্য বুকে হঠাৎ তীব্র ব্যথা হতে থাকে । যেন একটা বিশাল পাথর চেপে ধরছে। শ্বাস-প্রশ্বাস দ্রুততর হলেও স্বাভাবিক নয়। চোখেমুখে অব্যক্ত যন্ত্রণার সুস্পষ্ট ছবি। শুষ্ক চোখে বিন্দু বিন্দু জলের ধারা। সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়ে যেতেই ছুটে এসে ধরে ফেলে মণি, চুমকি আর রাজ। কিন্তু এ রাজ তো মনীষার রাজ নয়। এ অন্য কেউ, অন্য কোন রাজ ।

দ্বন্দ্ব

মাইক্রোফোনের সামনে পারমিতার হাসিমুখ। ফুটন্ত গোলাপের মত প্রস্ফুটিত। তিলক চমকে ওঠে। আজ পারমিতাকে এত বছর পর দেখবে তিলক ভাবতে পারেনি। 'মৈনাক শিল্প গোষ্ঠী' আয়োজিত রবীন্দ্র ভবনের আজকের অনুষ্ঠান পরিচালনা ও ঘোষণা করছে পারমিতা। দর্শকের মুগ্ধ চোখকে অন্ধ করে রেখেছে তার ভাষা, তার রূপ ও জলতরঙ্গের মত বেজে ওঠা তার মধুর কণ্ঠ।
বুকের ভেতরটা মোচড় দিয়ে ওঠে তিলকের। ভাষার জন্যেই সে পারমিতার ভালবাসাকে উপেক্ষা করেছে। অতীতের চাপা দেওয়া বেদনাটা হঠাৎ মাথা চাড়া দিয়ে উঠে তিলককে ব্যতিব্যস্ত করে তুলছে। সন্ধ্যার স্বর্গীয় পরিবেশে দিবাস্বপ্নে সে বিভোর হয়ে যায়। অতীতের সুখস্মৃতি তার সামনে ছায়াছবির মত ভেসে ওঠে।

তিলকের দাদা চন্দন দক্ষিণ ত্রিপুরার এক জনবহুল গ্রামের পোষ্টমাষ্টার। বাবার নির্দেশে তিলককেও যেতে হল সেখানে। গ্রামের হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুলটির খ্যাতি সর্বত্র। তিলক নবম শ্রেণীতে ভর্তি হয়। দাদার কোয়ার্টারে দাদা-বৌদির সঙ্গে থাকতে তার অসুবিধা হয়নি। সমস্যা অন্যত্র। ক্লাশ শুরুর কয়েকদিন পর। প্রথম ক্লাশে গিয়েই তার অস্বস্তির শুরু। ইংরেজি শিক্ষক কড়া ধাঁচের লোক। ঢুকেই জীবন নামের এক ছাত্রকে বলেন,
'জীবন্যা হড়া ক।'
'আঁই শিখিনঅ, ছার।'
'কা?'
'ন হারি ছার।'
'অডা কনি দিয়ারে লুডাইলামু।'

কয়েকদিন পর আগরতলায় ফিরে গিয়ে সে বাবাকে জানায়, ওই স্কুলে পড়া তার পক্ষে সম্ভব নয়। শিক্ষক ক্লাসে এমন ভাষায় কথা বলবে সে ভাবতেও পারেনি। স্থানীয় ভাষার বেশীর ভাগটাই সে বোঝেনা। বাংলা ভাষা অত জঘন্যভাবে ব্যবহৃত হতে পারে তার জানা ছিলনা। নির্দিষ্ট দিনের দুদিন পরও সে বাড়িতে। রাতে বাবা তাকে ডেকে এনে খুব কড়া ভাষায় তিরস্কার করে বললেন, 'তোমাকে আমি সেখানে ভালভাবে পড়াশুনা করবার জন্যে পাঠিয়েছি। ভাষা শেখার জন্যে নয়। তোমার পছন্দ না হলেও এটা ওদের মাতৃভাষা। এ ভাষায় কথা বলেই সে গ্রামের ছেলেমেয়েরা ডাক্তার, ইঞ্জিনীয়ার, ব্যাঙ্ক অফিসার, সাহিত্যিক হচ্ছে। শুধু তা নয়। দেশে বিদেশে সুনাম অর্জন করছে। কয়েকদিন গেলেই তোমারও ঠিক হয়ে যাবে।

তোমার জীবনে এটা একটা বাড়তি অভিজ্ঞতা হবে।' একটু থেমে কঠোরভাবে নির্দেশ দেন, 'কাল ভোরের গাড়িতে গিয়ে ক্লাশ করবে। ভাষার কথাই যখন তুলেছ, আমি দেখব তুমি বাংলা ও ইংরেজিতে সর্বোচ্চ নম্বর পাও কিনা।'

ফিরে এসে সে ক্লাশ শুরু করে। দাদার সঙ্গে তার মেলামেশা সহজ নয়। দাদাকে ভয় পায়। এজন্যেই বাবা তাকে এখানে পাঠিয়েছেন। বৌদির কাছেও সে সহজ নয়। নিঃসন্তান বৌদি তাকে সন্তানের মত দেখে। তাছাড়া বৌদিও স্থানীয় ভাষাটা একদম বোঝেনা। বৌদির শোনার সুযোগও কম। হঠাৎ অন্ধকার দূর হয়ে তিলকের মনে আশার আলো ফুটে ওঠে।

কোয়ার্টারের পাশের বাড়ির একটি ফুটফুটে সুন্দর মেয়ে বৌদির কাছে আসে। বৌদি মেয়েটিকে চুল বেঁধে টিপ পরিয়ে সাজিয়ে দেয়। আদর করে চুমু খায়। দাদা বৌদিকে 'তোমার মেয়ে' বলে ক্ষ্যাপায়। অংক করার জন্যে তিলকের কাছে আসে। তিলক বৌদির মেয়েকে পাত্তা দেয়না। বৌদি তার পিঠে মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে আদর করে। মেয়েটির নাম পারু। চমৎকার মেয়ে। চোখগুলি খুব সুন্দর। একবার বলে দিলে সহজেই সে ধরতে পারে। এবার সে বৌদির পায়ের কাছে বসে অনুরোধ করে, মেয়েটির কাছ থেকে স্থানীয় ভাষা শেখার ব্যবস্থা করে দেবার জন্যে। বৌদি মুখ টিপে হাসে। বাড়ির বাইরে এসে বৌদি পাল্টে যাচ্ছে। তার সঙ্গে হাসি রহস্যের কথা বলতে চায়। তিলকের ভাল লাগেনা। বয়সের তফাৎটা বাধা হয়ে দাঁড়ায়।

তোয়াজে গলে গিয়ে বৌদি হাসিমুখে কটাক্ষ করে বলে, 'আমার মেয়েকে তোমার প্রয়োজন ভাষার জন্যে। একটা শর্তে রাজি হতে পারি, যতক্ষণ তুমি পড়াবে ততক্ষণ সে তোমাকে ভাষা শেখাবে।'

পারু মেয়েটি সত্যি খুব সুন্দর। কিন্তু সে যখন কথা বলে, তিলকের শরীরটা শির শির করে ওঠে। মেয়েটির দিকে তাকাতে ইচ্ছে হয়না। সে যখন কথা বলে তার সমস্ত সৌন্দর্য কালো মেঘে ঢাকা পড়ে যায়। তিলকের মনটাও বিষাদে ভরে ওঠে। অথচ মেয়েটি বকবক করে কথা বলতে ভালবাসে। তার সংকোচ নেই। কারণ সে জানে সে সুন্দরভাবেই কথা বলছে। বৌদি ও তিলকের মুচকি হাসিটা কেন সেটা সে বুঝতে না পেরে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে। বৌদির সামনে দাদা বা তিলক না থাকলে বৌদি পারুর কথা শুনে হাসে না, আদর করে।

স্কুল থেকে ফিরে এসে তিলকের মনটা ভাল নেই। রাতে খাবারে মন নেই। বৌদি ভেবেছে স্কুলে পড়াশুনা নিয়ে হয়তো চাপ পড়েছে। পরদিনও তিলকের অবস্থাটা লক্ষ্য করে দাদা পোষ্ট অফিসে যাবার পর বৌদি তিলককে জেরা করে। বেগতিক দেখে তিলককে মুখ খুলতে হয়। গত পরশুদিন তাদের ক্লাশের তিমির অন্যদের সঙ্গে তাকেও ওর বাড়িতে যেতে বলেছিল। কিন্তু সে যায়নি। গতকাল সে তাকে বলেছে, 'তোঁয়ার কিয়াঁ অইছে কালিয়া? তোঁয়ারে যাইবার লাই আঁর কিয়া লয়িতা কইত্যো অইব নি?' তিলক সব বুঝতে পারলেও 'লয়িতা' শব্দটা

আকাশ পাতাল ভেবেও অর্থ খুঁজে পায়নি। শব্দটার অর্থ তার প্রয়োজন। গতরাতে পড়াশুনার ব্যাঘাত ঘটেছে। তবুও কাজ হয়নি।

বৌদি শুনে হেসে গড়িয়ে পড়ে। বিজ্ঞের মত বলে, 'এর মানে বুঝতে পারনি? বুদ্ধি করে ভেবে অর্থটা বের করতে হবে। সবকিছু তোমার জানা থাকবে এমন কোন কথা নেই। 'লয়িতা' মানে 'লইয়া' এ সোজা শব্দটা বুঝতে তোমার অত কষ্ট হল? অর্থাৎ তোমাকে কি সঙ্গে লয়ে বা নিয়ে যেতে হবে?'

বৌদির অনুবাদ বা অনুমান তিলকের পছন্দ হয়নি। কথাটা মিলছে না।

তিলককে সন্তুষ্ট করতে না পেরে বৌদিও খুশি হতে পারেনি। কোয়ার্টারের পেছনে গিয়ে পারুকে ডেকে আনে। পারু বিরক্ত হয়ে বলে যে সে তিলকদাকে বেশ কয়েকদিন বলেছে। উনি ভুলে যান। তার কথা মনোযোগ দিয়ে শোনেন না। শুধু মুচকি হাসেন। সে বারবার বলতে পারবে না। 'লয়িতা' মানে সমাদর অর্থাৎ আদর-আপ্যায়ন।

পারু এক দৌড়ে চলে যায়। তিলকের মুখে প্রশান্তির হাসি ফোটে। বৌদি চোখ কপালে তুলে অবাক হয়ে বলে, 'কী সাংঘাতিক কথা! লয়িতা মানে সমাদর, বোঝার উপায় আছে? ভেবেছিলাম লয়ে মানে নিয়ে।' প্রশ্রয় পেয়ে তিলক তাচ্ছিল্য করে বলে, 'তুমি তো ভেবেছো বিশারদ হয়ে গিয়েছো। নিজে নিজে অর্থ করতে যেওনা, বিপদে পড়বে।'

'তাইতো দেখছি।'

'বুদ্ধি আছে দাদার। সত্যি! প্রশংসা করতেই হবে।'

'কীরকম?'

'কেউ কিছু বলতে এলে স্থানীয় একজন ষ্টাফকে দেখিয়ে দিয়ে বলে, আপনি ওনার সঙ্গে কথা বলুন। আমি কাজ করছি, পরে আমি জেনে নেব। ঘটনা হচ্ছে, দাদা পোষ্টমাষ্টার। দাদার কথা সবাই শুনবে। আমার কথা শুনবে কে?'

'কিন্তু ভাষাটা শিখবে কী করে?'

'না শিখলে তোমার মত বিশারদ হব।'

বৌদি হাত বাড়িয়ে তিলককে পায়নি। কথাটা বলেই সে পালিয়ে গেছে। তিলক ঠিক করে এখন থেকে একটা নোট বইয়ে কঠিন শব্দগুলো টুকে রাখবে। দাদা-বৌদিরও উপকার হবে। ভবিষ্যতে কাজে লাগতে পারে।

তিলক অনেক ভেবেচিন্তে নোট বইয়ে লিখতে শুরু করে। নোয়াখালি ভাষাটা বড় অদ্ভুত! এর যে কত রকমফের, তা আয়ত্ত করা সোজা ব্যাপার নয়। তাদের পাশের বাড়িতে এক ভাড়াটে ছিলেন। উনার ছেলে আশু তার সমবয়সী। আশুর বাবা চাকরি করেন। সজ্জন লোক। তাদের বাড়িতেও আসেন। আশুর দাদুর ভাষা শুনে সবাই হাসতো। একদিন ওরা

বাড়ির পাশের খালি জায়গায় খেলছিল। আশুকে খুঁজে না পেয়ে তার দাদু ওদেরকে জিজ্ঞেস করেন, 'এরই তিলগ, আংগ আশু কনাই? হিগারেত হাইয়ের না।' তারা জানিয়ে দেয় যে আশু আজ তাদের সঙ্গে খেলতে আসেনি। সে কোথায় তারা জানেনা। দাদু ভীষণ রেগে গিয়ে বললেন, 'আইজ্জা হিগা আইয়ুক। হিগারে ভূতিরর হঙ্গে বান্দি হিডিম। আইজ্জা হিগার অগ্যাদিন, নাঅয় আঁর অগ্যাদিন। হিগার বাউরে হোনাইলে এক্কারে হিডি বমন করাই ছাইড়বো। হেসুমে বাউ আঁর কথাঅ হুইনত ন। আঁই না হাইল্লে কিত্তাম? কথুন আনমু হিগারে? আঁর জালা অইছে।'
তিলক যতরকম শোনে, নোটবইয়ে লিখে রাখে। অবসর সময়ে মুখস্থ করবে। কাউকে দেখাবে না। ইতিমধ্যে কয়েকজন বন্ধু হয়ে গেছে। এদের মনটা ভাল। কিন্তু মেজাজটা আষাঢ় মাসের আকাশের মত। যে কোন মুহূর্তে অন্ধকার হয়ে বৃষ্টিতে ভাসিয়ে দিতে পারে। তিলক অনেক ভেবেচিন্তে নোট বইয়ে লিখতে শুরু করে। সামান্য ভুলও হতে পারে। তবে অর্থের তেমন তারতম্য হবে বলে মনে হয়না। মানেটা সে ধরতে পারবে।

তিলক মন দিয়ে পড়াশুনা করে। স্কুলের শিক্ষকরা তার প্রশংসায় পঞ্চমুখ। ভাইয়ের প্রশংসায় চন্দনের বুক গর্বে প্রসারিত হয়। ক্লাশ নয়, সমস্ত স্কুলের ছেলেরা জানে তিলক নামে নতুন আসা ছেলেটা ব্রিলিয়ান্ট। সহপাঠী ছেলে-মেয়েদের তার সম্পর্কে মন্তব্য, 'ইগা হোলা ন, কাল।' কোয়ার্টারে তিলক-বৌদি, দাদা-বৌদি, পারু-তিলক হাসতে হাসতে গড়িয়ে পড়ে। পারুর এ বাড়িতে অবারিত দ্বার। নবম শ্রেণীতে ওঠার পর শাড়ি পরে স্কুলে যায়। শরীর ভারী হবার সাথে সাথে তার চলাফেরাও একটু ভারী হয়ে ওঠে। ভাষা নিয়ে তিলক খুব ক্ষেপায়। পারু রাগ করে। পারু ইচ্ছে করলে সুন্দর করে বলতে পারে। কেন যে বলেনা, তিলক বুঝতে পারেনা। কথা না বললে পারুকে খুব সুন্দর দেখায়। কিন্তু মুখের ভাষা শুনে মনটা বিরক্তিতে ভরে ওঠে। তিলকের জীবনে অনেক পরিবর্তন আসে। হায়ার সেকেণ্ডারীতে চমৎকার রেজাল্ট করেছে। মেডিক্যালে চান্স পেয়ে সে দিল্লী চলে যায়। এম বি বি এস কোর্স শেষ করে ত্রিপুরা সরকারের চাকরিতে যোগ দেয়।

পারু বাংলায় অনার্স নিয়ে পাশ করেছে। বছর খানেকের মধ্যে চাকরিও পেয়ে যেতে পারে। তিলকের চাকরির খবর পেয়ে পারু আনন্দে আত্মহারা। আশায় বুক বেঁধে সে তিলকের সঙ্গে দেখা করতে আসে। তাকে দেখে তিলক চোখ ফেরাতে পারবেনা। তার জীবনে সে অনেক পুরুষ দেখেছে। কারও সাথে তার প্রিয় তিলকের তুলনা হয়না। তার চরিত্র নিষ্কলঙ্ক, ব্যবহার মার্জিত, মনটা উদার এবং ব্যক্তিত্ব অসাধারণ। কিন্তু? না, কোন কিন্তু নেই। পারুর মাতৃসমা বৌদি রয়েছে। অমত করলে কান মলে দেবে তিলকের।

বৌদি পারুকে নিয়ে তিলকের ঘরে হাজির। পারুকে এগিয়ে দিয়ে জিজ্ঞেস করে,'ওকে চিনতে পারিস কিনা দেখতো।' বৌদির ইঙ্গিতে পারু তিলককে প্রণাম করে দাঁড়িয়ে থাকে। তিলক

চমকে ওঠে। ভালভাবে দেখে হঠাৎ পারুকে কাছে টেনে বললো, 'তুই তো লেডি হয়ে গেছিস। খুব সুন্দরী হয়েছিস তো! কী পড়িস?'

বৌদি খুশী হয়ে জবাব দেয়, 'পারু শান্তিনিকেতন থেকে বাংলায় অনার্স নিয়ে বি এ পাশ করেছে। চাকরিও পেয়ে যাবে।'

'কীরে পারু, এখন সুন্দর করে কথা বলতে পারিস? ইগা হোলা ন, কাল — মনে পড়ে তোর?'

পারু দৌড়ে গিয়ে বৌদিকে জড়িয়ে ধরে হাসতে থাকে। তিলক অত্যন্ত ব্যস্ততার সাথে বেরিয়ে যায়। পারুর মন গভীর বেদনায় বিদ্ধ হয়। তিলকের উদাসীনতা আর অবহেলায় সে আহত। বৌদির দিকে মুখ তুলে তাকায় পারু। ওই একটি চাহনিতেই বৌদি তার মনের ব্যথা টের পেয়ে যায়। দৃঢ়তার ছাপ ফুটে ওঠে বৌদির চোখেমুখে। পারুকে বৌদি যেতে দেয়নি। আজ রাতে একটা হেস্তনেস্ত করে ছাড়বে সে। দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান হওয়া প্রয়োজন। বৌদিকে এর সমাধান করতেই হবে।

তিলকের ফিরতে একটু রাত হয়। বৌদি অপেক্ষা করছে দেখে সে অবাক। বিরক্তি প্রকাশ করে কপটভাবে। কিন্তু বৌদির ওপর খুশি হয়। সে ঘুমোতে যাবে, ঠিক সেই মুহূর্তে বৌদি এসে ডেকে নিয়ে যায়। দাদা নেই। বৌদির ড্রয়িং রুমের সোফায় সে আরাম করে বসে। পাশের রুমের খাটে যে পারু শুয়ে আছে তা তিলক জানবে কী করে? বৌদি তিলকের চোখমুখ ভালভাবে দেখে। আন্তরিকভাবে জিজ্ঞেস করে, 'পারুর ব্যাপারে কিছু ভেবেছিস?' তিলকের ঘুমের আবেশটা কেটে যায়। বিস্ময় প্রকাশ করে জিজ্ঞাসা করে, 'পারুর কোন্ ব্যাপারের কথা বলছো বৌদি?'

'পারুকে তোর পছন্দ হয়েছে তো? তোর বিয়ের কথা বলছি। সে তো আশা নিয়ে প্রতীক্ষা করছে।'

'বল কী! আমিতো ভাবতেও পারছি না। আমি কি তাকে কথা দিয়েছি ? বা আমার কোন আচরণে তেমন প্রকাশ পেয়েছে?'

'তুই অতো বিরক্তি নিয়ে কথা বলছিস কেন?'

'কেউ শুনলে আমার সম্পর্কে কী ভাববে বলতো?'

'পারুকে আমার খুব পছন্দ। ভেবেছিলাম, তুই অমত করবি না।'

'পারুকে বিয়ে করা আমার পক্ষে সম্ভব নয় বৌদি। আমি ভাবতেও পারছিনা, তুমি এমন প্রস্তাব দেবে।'

'পারু সুন্দরী, শিক্ষিতা, আমাদের সবার পরিচিতা। সে তোর অযোগ্য হতে পারে আমি কখনও ভেবে দেখিনি।'

'সুন্দরী আর গুণবতী হলেই বিয়ে করা যায়না।'

'কী হলে বিয়ে করা যায়? পারুর মধ্যে অপূর্ণতা কিসে? খুঁতটা কোথায়?'

'সে আমি তোমাকে বলতে পারব না। সে তুমি বুঝবে না বৌদি।'

বৌদির গলাটা অভিমানে ভারী হয়ে ওঠে। যেন বহুদূর থেকে ভেসে আসে তার শেষ কথাটি। 'ঠিকই বলেছিস তিলক! বড় হয়েছিস, ডাক্তার হয়েছিস। বৌদি অজ্ঞ মানুষ।'

পারু সব শুনেছে। ব্যথায় ওর মুখটা নীল হয়ে যায়। যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করতে থাকে। তিলক তার যৌবনের প্রথম অতিথি। ওর সবল বক্ষে চিরদিনের জন্যে আশ্রয় নিতে চেয়েছে পারু। প্রত্যাখানের কোন কারণ খুঁজে না পেয়ে গভীর বেদনায় মনে অশান্তির ঝড় বয়ে যায়। খাট থেকে নেমে এসে বৌদিকে জড়িয়ে ধরে কান্নায় ভেঙে পড়েবলে, 'তোমাকে আর ছোট হতে আমি দেবনা, বৌদি!'

ভূত দেখার মত চমকে ওঠে তিলক। একটা বিদ্যুৎ শিহরণ বয়ে যায় তার দেহে, মনে। বৌদির অভিমানে আর পারুর অনুযোগে তার বুকের ভেতরটা ভাঙতে থাকে। শক্ত মনটা দ্রবীভূত হবার আগেই পারুর ভাষার ব্যাপারটা তাকে বিদ্রোহী করে তোলে। শিউরে ওঠে সে। কিছুক্ষণ পর শূন্য ঘর থেকে মনে অনেক প্রশ্ন নিয়ে নীরবে ফিরে আসে নিজের ঘরে। সে রাতে তিলক ঘুমোতে পেরেছিল এই ভেবে যে, সে ঠিকই করেছে।

আজ এত বছর পর পারুর মুখের ভাষা শুনে নিজেকে প্রশ্ন করে তিলক, সত্যিই কি সে ঠিক করেছে? বুকের ভেতরটায় একটা শিরশিরানি অনুভূত হচ্ছে। সে-রাতে ঘুমোতে পারলেও আজ রাতটা সে ঘুমোতে পারবে না, পারমিতা বা বৌদির সম্পূর্ণ অজান্তে।

হাস্যময়

রাতের কালো থাবায় দিক-বিদিক অন্ধকার। অভিশপ্ত লোডশেডিং-এর দৌলতে গাঢ় অন্ধকার স্পষ্টতর। নতুবা প্রহরের পর প্রহর মগ্ন চৈতন্যে কেটে যেত বর্ণালীর। অন্ধকারের দুর্বোধ্যতায় শরীরে ভয়ের শিরশিরানি নয়, বুকের ভেতর যেন নিরন্তর চাপ চাপ রক্তক্ষরণ। আশপাশের বাড়িঘরে বিন্দু বিন্দু আলো। দূরের আলোকিত রাজপথে চোখ আটকে গেলেও মন তার অশান্তির তরঙ্গে বিষণ্ণ, অবসন্ন।

সংসারে কোন মানুষই ত্রুটিমুক্ত নয়। তবে পুরুষের বিচ্যুতির ঝোঁকটা একটু বেশি। শক্ত হাতে ও সতর্কভাবে নারীকে হাল ধরে সঠিকভাবে পরিচালনা করতে হয়। ক্ষোভে-দুঃখে বা কঠিন-কঠোর হয়ে পরিত্যাগ নয়, ছলে-বলে-কৌশলে একাগ্রচিত্তে স্বামীর মন জয়। তবেই তো নারী আদ্যাশক্তি, সাধ্বী ও ধর্মপত্নী।

বর্ণালীর অজানা নয় এ সব। 'বিবাহ' নামক ঘটনায় সকল নর-নারীর জীবনে পরিবর্তন ঘটে। পুরুষের পরিবর্তনটা ভৌত হলেও নারীর ক্ষেত্রে পরিবর্তনটা রাসায়নিক। শত চেষ্টা করেও পূর্বাবস্থায় ফেরা অসম্ভব।

বিয়ের কথা পাকা হতেই সব মেয়ের মত ওরও সমর্পণের অদম্য আকাঙ্ক্ষা আর পুরুষের বিচ্যুতির ঝোঁক, কোমল মনে ঝড় তুলেছিল। আজ সে ঝড়ের গতি বিক্ষিপ্ত। বিচ্যুতির পথে নয়, অপ্রত্যাশিত এক অজ্ঞাত পথে। বর্ণালী আজ বড়ো অসহায়, অবলা। নির্বোধের মত মর্মদাহে জ্বলতে থাকে। নিষ্ফল আক্রোশে ক্ষতবিক্ষত ওর মন। পুরুষের চরিত্রে নানা ধরণের ঝোঁক। কেউ অপরিমিত মদ্যপান করে, কেউ বিরতিহীন একটানা ধূমপান করে, পঞ্চাশ পেয়ালা চায়েও কারো অরুচি নেই, কেউ বা পরকীয়াতে উদ্যোগী হতে চায়, কেউ স্ত্রীর উপর বল প্রয়োগ করে বীরত্ব প্রকাশ করে, আবার কেউ গৃহস্থালী কাজ ও রান্নাবান্না নিয়ে খেচাখেচি করে। বর্ণালীর সমস্যা এর কোনটাই নয়। ওর সমস্যা সম্পূর্ণ ভিন্ন, অনভিপ্রেত ও অপ্রত্যাশিত। দুটি পরিবার আনুষ্ঠানিকভাবে সর্বসম্মত হবার আগে রাজধানী হোটেলের একটা কক্ষে সম্মিলিত হয়। বড়দা কোন ঝুঁকি নিতে রাজি নয়। গোপালকৃষ্ণের সাথে ওর দুই সহকর্মী আর পাড়াতো বৌদি। বর্ণালীর বাহিনীতে চার বান্ধবী, বৌদি ও জামাইবাবু। মিনিট দশেকের মধ্যেই দুইবাড়ির দূরভাষে সংবাদ পৌঁছে যায়। মুহূর্তে কেঁপে ওঠে দুইবাড়ির আশপাশ নারীকণ্ঠের শুভ উলুধ্বনিতে।

বর্ণালীর মস্তিষ্কে একটা মৃদু ধাক্কা আছড়ে পড়েছিল। বৌদির উচ্ছ্বসিত প্রশংসায় তা বিস্তার লাভ করতে পারেনি। বান্ধবীরা অভিভূত। জামাইবাবুও তৃপ্ত ও সন্তুষ্ট। দুই সহকর্মী ওদের

প্রিয় জি. কে.-র প্রশংসায় মুখরিত। পাড়াতো বৌদি সম্মতির পর বর্ণালীর নিচু মুখটা তুলে ধরে আদর করে, চুমু খায়।

ফেরার পথে গাড়িতেই হাসির কথা ওঠে। এক বান্ধবী উচ্ছ্বসিত, 'কী সহজ সরল হাসি! কথাবার্তায় কোন ভণিতা নেই।' বৌদি, 'মনটাও খুব সরল।' জামাইবাবু, 'ছেলেটার হাসি প্রাণ খোলা।' এক বান্ধবী কপট ধমক দিয়ে বলেছিল, 'একটানা অত জোরে হাসবেন না তো মশাই। সবাই পছন্দ নাও করতে পারে।' এখানে সবাই বলতে বর্ণালী। গৌরবের বহুবচন। ওর তির্যক দৃষ্টি আর রহস্যময় হাসিতে গোপালকৃষ্ণের না বোঝার কথা নয়। আর একপ্রস্থ একটানা হেসে খুব গম্ভীর হয়ে জবাব দিয়েছিল, 'হাসিকে অবজ্ঞা-উপেক্ষা করবেন না। যে হাসতে পারেনা, তার মত দুর্ভাগা আর কেউ নেই। যত খুশি হাসবেন। একটানা হাসিতে ভেতরের দূষিত পদার্থ বের হয়। শরীরে সুস্থতা আসে।'

সবার সাথে বর্ণালীও এবারে হেসে উঠেছিল।

সে হাসি ওর জীবনে অভিশাপ নিয়ে আসবে স্বপ্নেও ভাবেনি। যতই দিন যায়, ওর জীবনটা দুর্বিষহ হয়ে ওঠে। গত তিন মাস ধরে ক্ষোভে ক্ষোভে গড়া প্রস্তুতি আজ নিশ্চিহ্ন। ক্ষীণ প্রত্যাশার প্রদীপ নিভে গিয়ে তার জীবনটায় ঘন অন্ধকার নেমে আসে।

বড় ধাক্কাটা আসে মাসখানেক আগে। এক আত্মীয়ের বিয়ের জমকালো অনুষ্ঠান। ওরা তন্ময় সরকারের মুখোমুখি। বৌদির দূর সম্পর্কের ভাই তন্ময়। পরিচয়কে কেন্দ্র করেই প্রণয়-পরিণয়ের দিকে ওর একাগ্র উদ্যোগ। বর্ণালী এগোবার পথ বন্ধ করে দেয়। তন্ময় ইঞ্জিনিয়ার শুধু নয়, সুন্দর সুপুরুষ হিসেবে যথেষ্ট লোভনীয় পাত্র। অত্যধিক ধূমপান আর দাম্ভিক কথাবার্তায় তার সমগ্র উদ্যোগ বর্ণালীর হৃদয়ে কোন সাড়া জাগাতে পারেনি। সাদর আমন্ত্রণ সত্ত্বেও বিয়েতে আসেনি তন্ময়। গোপালকৃষ্ণের সাথে পরিচয় করিয়ে দিতেই সহাস্যে হাত মেলায়। হাল্কা কথাবার্তা শুরু হতেই হঠাৎ একটানা সেই জোর হাসি। চমকে উঠে বর্ণালী মৃদু হাসিতে গোঁজামিল দেয়। চতুর তন্ময়ের চোখে অন্য দৃষ্টি। অবজ্ঞা না অনুকম্পা তখন ঠিক বুঝতে পারেনি। বর্ণালীর মর্যাদা বোধ আহত হয়। অপমানে নীল হয়েও শরীরের রক্ত টগবগ করে ফুটতে থাকে। কী খেয়েছে, কী বলেছে, কীভাবে ফিরে এসেছে, কিছুই মনে করতে পারেনা বর্ণালী।

পরস্পরকে গভীরভাবে জানবার আগেই ওদের বিচ্ছেদ শুরু। মানসিকভাবে ঢের আগেই বিচ্ছিন্না। শরীরের কোষে কোষে উষ্ণ রক্তস্রোত নিয়েই আজ অপরাহ্নে ওকে টেনে কলেজটিলা নিয়ে আসে বর্ণালী। ভ্যাবাচ্যাকা খেতে খেতে স্ত্রীকে দেখে গোপালকৃষ্ণ। সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই বর্ণালীর। বৃষ্টিহীন শ্রাবণ মাসের উত্তপ্ত দিনে দুজনের কপালেই বিন্দু বিন্দু ঘাম। গোপালকৃষ্ণের কৌতূহলী প্রশ্ন, 'এখানে এসময়ে! এ নির্জন পরিবেশে! কিছু বলবে নাকি?'

'হ্যাঁ, একটা সিরিয়াস ব্যাপার আলোচনার জন্যেই এসেছি। স্পষ্ট জবাব দেবে কিন্তু।' দাঁতে দাঁত চেপে বর্ণালীর ঘোষণা।

'আমি কি কখনও অস্পষ্টভাবে বলেছি বর্ণা?'
বিস্মিত হয়ে ওর প্রশ্ন। সরল ও নিষ্পাপ অভিব্যক্তি ওর চোখেমুখে। দপ করে বর্ণালীর উষ্ণ রক্তস্রোত থমকে দাঁড়ায়। একটা মমত্ববোধ মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে মুহূর্তে। কিন্তু বর্ণালী আজ বেপরোয়া, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। একটা হেস্তনেস্ত করতে উদ্যত। মস্তিষ্কের কোষে কোষে আগের মতই উষ্ণ রক্তস্রোত।
'আচ্ছা, তুমি অত জোরে একটানা অনেকক্ষণ হাস কেন?' প্রশ্ন করে ওর প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করে বর্ণালী।
আবার সেই একটানা দীর্ঘ হাসি। রাগে বিরক্তিতে বর্ণালীর শরীর কুঁকড়ে ওঠে। হাসি থামিয়ে বলে, 'তুমিও হাসবে। প্রাণ খুলে হাসবে। হাসলে ভেতরের সব দূষিত ....।' বাধা দিয়ে কঠোর প্রতিক্রিয়া বর্ণালীর, 'চুপ করো। তোমার হাসিতে আমার রক্ত দূষিত হয়। কারণে অকারণে তুমি হাস কেন? হাসলেও অত দীর্ঘ সময় ধরে জোরে কেন? দরজা বন্ধ করে যত খুশি হাসো। মানুষ কিংবা কোন প্রাণীর সামনে নয়।'
'আমি অকারণে হাসি? ভুল ধারণা তোমার। প্রতিটি হাসির পেছনেই একটা কারণ থাকে। অকারণে হাসব কেন?'
'হ্যাঁ, অকারণেই অস্বাভাবিকভাবে হাস তুমি।' দৃপ্ত কণ্ঠে বলে বর্ণালী। আবার সেই একটানা দীর্ঘক্ষণ জোরে হাসি। হাসি থামিয়ে গোপালকৃষ্ণ তড়িৎগতিতে ছুটে যায় চৌমাথায়। হকার থেকে একটা দৈনিক কাগজ কিনে এনে চোখ বুলিয়ে নেয়। বাম হাতের করতল আলতোভাবে বর্ণালীর গ্রীবায় রেখে প্রশ্ন করে, 'এসব পড়ে না হেসে থাকা যায়?'
'কেন কী আছে এতে?'
'এই দেখো, জনজীবনে সর্বাগ্রে শৃঙ্খলা আনতে হবে। বিশৃঙ্খল জাতি কখনও মহান হতে পারেনা - মুখ্যমন্ত্রী কেশব প্রসাদ যাদব। ব্যক্তি জীবনে চরম উচ্ছৃঙ্খল কেশব প্রসাদের শিক্ষা নেই, সংস্কৃতি নেই, শিষ্টাচারও নেই। প্রথম জীবনে গুণ্ডামি করে এখন মুখ্যমন্ত্রী হয়ে জাতিকে উপদেশ দিচ্ছে। এসব দেখে না হেসে থাকা যায়? এদিকটায় পড়ো - পেলে বড় প্লেয়ার হতে পারে, কিন্তু ফুটবল খেলার কিচ্ছু বোঝেনা - ব্রাজিলের কোচ স্কোলারি। অদ্ভুত ঘটনা! ফুটবল সম্রাট পেলে খেলাটা বোঝেনা? না হেসে থাকা যায় এসব গায়ের জোরের কথা শুনে? ফ্রন্ট পেজের হেড লাইনটা দেখ - সরকার ২০১০ সনের মধ্যে সারা দেশকে দারিদ্রমুক্ত করতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। চমৎকার! ২০১০ সন পর্যন্ত এ সরকার ক্ষমতায় থাকবে তো? থাকবে না, এটা ওরা নিজেরাও জানে। উদ্দেশ্য, দেশবাসী ২০১০ পর্যন্ত আমাদের ক্ষমতায় রাখো। পরেরটা পরে হবে। এসব আজগুবি কথা শুনে ভেতরটা জ্বলতেই আমার হাসি পায়। দীর্ঘ জোর হাসিতে সব দুঃখ জ্বালা বেরিয়ে যায়। নতুবা ক্ষোভের পাহাড় জমে ভেতরটা ধিকি ধিকি জ্বলতে থাকবে। মেজাজ বিগড়ে শরীর অসুস্থ হয়ে পড়বে।'
'এটা সবাই জানে রাজনীতিতে স্বচ্ছ লোক নেই বললেই চলে। ওদের কথাবার্তা, চালচলন হাসির খোরাক যোগায়, এটাও ঠিক। কিন্তু তা বলে একটানা দীর্ঘ হাসি? সত্যিই অসহ্য।'

'একটানা দীর্ঘ হাসি না হলে কোন কাজ হয়না।'

'না, তুমি অমন দীর্ঘক্ষণ হাসতে পারবেনা। আমি সহ্য করতে পারিনা।'

'এভাবে না হাসলে আমি অসুস্থ হয়ে যাব। তোমার মত ভেতরের জ্বালা নিয়ে আধমরা হয়ে থাকতে পারবনা। আমি আমার এ অভ্যাস পাল্টাতে চাইনা।'

'তাহলে তুমি তোমার হাসিকে নিয়েই থাক। আমার পথে আমি থাকব।'

'বর্ণা, তুমি অবুঝের মত জেদ করছো। এটুকু বুঝতে চেষ্টা করো।'

'অবুঝ আমি না তুমি? তোমার মান-মর্যাদা আছে? পাড়াতে তোমাকে সবাই হাসুগোপাল বলে ডাকে। আর অফিসে জি.কে. উইদ্‌ইন ব্র্যাকেট লাফিং। তোমার মান সম্মানে না লাগলেও আমার লাগে।'

আবার সেই একটানা হাসি, দীর্ঘক্ষণ। হাসি থামিয়ে তার কৈফিয়ৎ 'পাড়াতে তিন গোপাল, ননীগোপাল, কৃষ্ণগোপাল আর আমি গোপালকৃষ্ণ। দুই গোপালেরই আগে শব্দ আছে। আমার আছে শেষে। সঠিক শব্দ বেছে নিয়েই সবাই আমাকে ডাকে 'হাসুগোপাল'। এতে দোষের কী আছে? মান-সম্মানেরই বা কী হল? মান সম্মান কি অত ঠুনকো? আর অফিসেও ......'

আর বলা হলনা। বলবেই বা কার কাছে? ততক্ষণে বর্ণালী অনেক দূরে। ধীরে ধীরে চলে যেতে থাকে। ভেতরের রক্তক্ষরণ যেন একটুও কমেনি। বাড়ি, পাড়া ও দপ্তরের সর্বত্রই তার হাসি সমাদৃত। কেউ কোন অস্বাভাবিকতা খুঁজে পায়না।

মহারাজগঞ্জ বাজারে চল্লিশ প্রহরের অবিরাম মহোৎসব চলছে। সবার সাথে গোপালকৃষ্ণও মহোৎসবে উপস্থিত। সবাইকে ছাড়িয়ে আসরের প্রথম সারিতে গিয়ে বসে। বরিশাল থেকে আসা দল কীর্তনে মাতিয়ে দিচ্ছে। প্রৌঢ় কীর্তনীয়ার সুরে-ভাবে-ভক্তিতে সবার চোখে জল। হঠাৎ তার সেই একটানা দীর্ঘক্ষণ জোরে হাসি। বর্ণালী পরিচিত মহল থেকে আড়ালে সরে পড়ে। আড়াল থেকে দেখে সেই কীর্তনীয়া গোপালকে জড়িয়ে ধরে অঝোরে কাঁদছে। আর সে হেসেই চলেছে। চারদিকে নারী কণ্ঠের মধুর হর্ষধ্বনি। সবার প্রশ্রয়ে সে উৎসাহিত। সংশোধনের পথ প্রায় বন্ধ। হাঁফিয়ে ওঠে বর্ণালী। অবসাদগ্রস্ত হয়ে ভাবে, বেঁচে থাকাটা নিরর্থক।

সুযোগের সদ্ব্যবহার করে তন্ময়। আকর্ষণীয় হয়ে সংগোপনে মিলিত হয় বর্ণালীর সাথে। ওর রূপের প্রশংসা করে। অমূল্য জীবনের কথা বলে ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠে। ভেতরের রক্তক্ষরণ বন্ধের প্রত্যাশায় সাড়া দিতে বাধ্য হয় বর্ণালী।

অবিরাম বর্ষণসিক্ত শ্রাবণের একদিন। সন্ধ্যার প্রাক মুহূর্তে বৃষ্টিটা বন্ধ হতেই গোপালকৃষ্ণ দলবল নিয়ে তার প্রচার দপ্তরের কাজে ছুটে যায় এম. বি. বি. ষ্টেডিয়ামে। প্রয়োজনীয় কাজ শেষ করতে আধ ঘন্টারও কম সময় লাগে। দলবল পাঠিয়ে দিয়ে সে একা ঘুরতে থাকে। আজ কতদিন তার বর্ণা একই কক্ষে থেকেও বিচ্ছিন্না। লেইকের কাছে জোড়া ইউক্যালিপটাস

গাছের আড়ালে সেইদিন ওরা বসেছিল। প্রত্যক্ষভাবে এখানেই ওদের শেষ কথাবার্তা। বাড়িতে কোন কথা হয়না আজকাল। হলেও অপ্রত্যক্ষ। অন্যমনস্কভাবেই এক অজ্ঞাতটানে সেদিকে এগোতে থাকে সে। অন্ধকার এখনও অতটা গাঢ় হয়নি। হঠাৎ সেই একই জায়গায় দৃষ্টি পড়ে, চমকে উঠে থমকে দাঁড়ায়। মুহূর্ত মাত্র। তারপর পেছন ফিরে দৌড়ে পালিয়ে আসে।

পালিয়ে যাওয়া মানুষটাকে তন্ময় চিনতে না পারলেও বর্ণালীর চোখে স্পষ্ট ধরা পড়ে। ভয়ে উত্তেজনায় সে অসহিষ্ণু হয়ে পড়ে। মুখের রংটা নিভে যাওয়া প্রদীপের মত ঘন অন্ধকার। বুকে টেনে নিয়ে তন্ময়ের আশ্বাস, 'হয়তো আমাদের ঘনিষ্ঠতা দেখে কেউ পালিয়ে গেছে। এতে অত ভয় পাবার কী আছে বর্ণালী?'

নিজেকে জোর করে ছাড়িয়ে নিয়ে বর্ণালীর অসহিষ্ণু জবাব, 'প্লীজ চলো, ফিরে যাই। আমার একদম ভাল্লাগছেনা।'

'সমস্যার স্থায়ী সমাধান না হলে এভাবেই কষ্ট পাবে।'

'মেয়েদের কত ঝামেলা, কত কী ভাবতে হয়, বিশেষ করে বিবাহিতা মহিলার, সে তুমি বুঝবেনা।'

'যত ভাববে তত তলিয়ে যাবে। ভাবনার গভীরতার কোন তল নেই। এখানে অত ভাববার কী আছে?'

বাড়িতে ঢোকার মুখে বর্ণালীর শরীরে কাঁটা দিয়ে ওঠে। ডান হাতের আঙুল দিয়ে শাড়ি সরিয়ে বাম হাতটা ঘষেও দেখে। সমস্ত শরীরে একটা অপরাধবোধ যেন সঞ্চালিত হতে থাকে। কেউ কিছু বলছে না, গোপালকৃষ্ণও না। সব ঠিকঠাক চলছে অন্যদিনের মত। তবু তার মনে হতে থাকে বাড়ির সবাই যেন ওকে অন্য দৃষ্টিতে দেখছে। সে দৃষ্টি সন্দেহের। তাদের দুজনের কথাবার্তা আগে থেকেই বন্ধ। গোপালকৃষ্ণের কোন পরিবর্তনও চোখে পড়েনা। কাগজ পড়ে খেতে বসে। আগের মতন সেই একটানা হাসি। তবে কি তাকে উপেক্ষা করছে? নিজের স্ত্রীর অধঃপতন দেখেও যে স্বামী নির্বিকার ও প্রতিক্রিয়াহীন অমন মানুষের সাথে দাম্পত্য জীবন কাটানো অর্থহীন।

তন্ময়ের সাথে বর্ণালীর সাক্ষাত অভ্যাসে পরিণত। সুখের নেশায় নতুন ঠিকানা খুঁজে নিতে আত্মহারা হয়ে ওঠে। কিন্তু দুটি মন এক হবার সার্থক পথে এগোতে পারেনা। ব্যক্তিগত মর্যাদা, দুটি পরিবারের সম্মানের কথা ভেবে কেঁপে ওঠে বিদ্রোহী অশান্ত মন। দীর্ঘদিনের সংগোপন সান্নিধ্যে আর আলাপে হয়তো মনের দাবী মেটে, শরীরের দাবী মেটেনা। বিক্ষুব্ধ ও বেপরোয়া হয়ে ওঠে ক্রমশ। কঠিনতম সিদ্ধান্ত নিতে বর্ণালী উদ্যোগী হয়। উপার্জনকারী নারী সে। অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতা রয়েছে তার, ভেসে যাবার ভয় কী?

ছুটির দিনটাই বেছে নেয় বর্ণালী। একটা ব্রিফ কেস্ আর কাঁধে ঝোলানো ভ্যানিটি ব্যাগে যা

নেবার নেবে। আর তো কখনও ঢুকবেনা এ বাড়িতে। নেবেওনা কিছু আর। গত রাত থেকে গুছোতে থাকে। একবার গুছিয়ে রাখে তো ঘন্টাখানেক পরে সব পাল্টে অন্য জিনিষ ঢোকায়। এভাবে বার বার অনেকবার। অত সীমাবদ্ধ জায়গায় তেমন কী আর নেবে? গোপালকৃষ্ণ দেখছে, কিন্তু কিছু বলছেনা। এতে ওর জেদ আরও বেড়ে যায়। শেষে সব ঢুকিয়ে তালা লাগিয়ে দেয়। খেয়ে নেয়। বাড়ির সবাই ভাবছে হয়তো বাপের বাড়ি যাবে। কোন অস্বাভাবিকতা কারও চোখে পড়েনা।

দিন আর রাতের বিদায়-আগমনের সন্ধিক্ষণে সিঁড়ি ভেঙে একতলায় নামে বর্ণালী। হাতে সেই ব্রিফ কেস্ আর ভ্যানিটি ব্যাগ। হঠাৎ তার কান্না ঠেলে বেরিয়ে আসতে চাইছে। অমন অসামাজিক কাজ করতে তার বুকের ভেতরটা ভেঙে পড়ছে যেন। তার কুমারীজীবন ছিল স্বচ্ছ, পবিত্র ও জটিলতাহীন। গোপালকৃষ্ণ ছাদে, হয়তো সব দেখছে। অন্তত এ মুহূর্তে একটু বাধা দিতে পারত, কৈফিয়ৎ চাইতে পারত। একটু অনুনয় করে রেখেও দিতে পারত। নিদেনপক্ষে ব্রিফ কেস্‌টা কেড়ে নিয়ে বাধা দিলে সে থেকে যেত।

হঠাৎ সম্বিত ফেরে ওর। শরীরে সঞ্চালিত রক্ত স্রোত উষ্ণ হয়ে মস্তিষ্কের দিকে ছুটে যেতে থাকে। শরীরটা টানটান হয়ে কঠিন কঠোর হয়ে ওঠে। দুচোখের জল মুছে নেয় ঝটিতি। গোপালকৃষ্ণের ভালবাসার জন্যে নতজানু হবে কেন? সে কি ভিখিরি? দৃঢ় তেজ নিয়েই সে সিঁড়ি ভেঙে ছাদে পৌঁছয়। স্পষ্টাস্পষ্টি কথাটা শুনিয়ে আসবে। বর্ণালীকে দেখেই গোপালকৃষ্ণ দীর্ঘ হাসিতে ফেটে পড়ে। ওর উষ্ণ রক্তস্রোত উষ্ণতর। আরও কাছে এসে ব্যঙ্গ করে তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বলে, 'আমাকে দেখে হাসছো? যত খুশি হাসো। কিছুক্ষণ পরে এ হাসিটা থাকলেই ভাল!'

'কেন হাসছি দেখে যাও' বলেই জোর করে বর্ণালীকে প্রাচীর বিহীন খোলা ছাদের কিনারায় নিয়ে যায়। ভয়ে ওর ভেতরটা হিম হয়ে আসে। লোডশেডিংয়ের জন্যে ছাদে গাঢ় অন্ধকার। রাজপথে আলো জ্বলছে। আলোকিত রাজপথের একপ্রান্তে বর্ণালীর দৃষ্টি স্থির। অপেক্ষারত তন্ময় ঝিরঝির বৃষ্টির মাঝেও অস্থিরভাবে পায়চারি করছে। বারবার ঘড়ি দেখছে। সুবিন্যস্ত কেশ-চুয়ানো জল বুকে-পিঠে গড়িয়ে পড়ছে। বর্ণালীর মুখেও হাসি ফোটে। ছাদের প্রান্ত থেকে সরে এসে সিঁড়ির উদ্দেশ্যে পা বাড়ায়। গোপালকৃষ্ণের সেই দীর্ঘ জোর হাসি। বর্ণালী দৌড়ে এসে গোপালকৃষ্ণকে টেনে আনে। ধমকের সুরে বলে, 'পাগল হয়ে গেলে নাকি? আর একটু হলেই পড়ে যেতে!'

বর্ণালীকে জোর করে ধরে তার অনুনয়, 'বর্ণা আজ একটু জোরে হাসবে? দেখবে মনের সব কষ্ট দূর হবে। ভেতরের সব মন্দ জিনিস বেরিয়ে যাবে।' বর্ণালী ওর কাণ্ডকারখানায় একটু শব্দ করেই হেসে ওঠে। জোর করেই গোপালকৃষ্ণকে ঠেলে সরিয়ে দেয়। শাড়ির আঁচল সুবিন্যস্ত করে। গোপালকৃষ্ণ ঘনিষ্ঠ হয়ে আবার ওকে উৎসাহিত করে, 'আর একটু জোরে

বর্ণা, প্লিজ।' শব্দ করে হেসেই বর্ণালী বিরক্তি প্রকাশ করে, 'আমি আর পারব না, পাগল কোথাকার!'

দীর্ঘ লোডশেডিং হঠাৎ তাড়াখাওয়া শেয়ালের মত পালিয়ে গিয়ে ছাদ আলোকিত হয়ে ওঠে। তন্ময় মাথা উঁচু করে ছাদে ওদের ঘনিষ্ঠতা দেখে। ওর বিস্ফারিত চোখ যেন ঠিকরে বেরিয়ে আসছে। ঝমঝম শব্দে প্রবল বর্ষা নামে। রাজপথে জমে থাকা নোংরা জঞ্জাল বর্ষার জলস্রোতে ভেসে যাচ্ছে। পরিচ্ছন্ন হতে থাকে রাজপথ। গোপালকৃষ্ণ মর্মভেদী হাসিতে বর্ণালীকে জড়িয়ে ধরে সম্পূর্ণ বর্ষণসিক্ত তন্ময়কে দেখায়। পেছন ফিরে প্রাণপণে ছুটতে থাকে তন্ময়। পলায়নরত সিক্ত তন্ময়কে দেখে বর্ণালীও অট্টহাসিতে ফেটে পড়ে। বার বার পেছন ফিরে তন্ময় ওদের অবিরাম বিকট হাসি দেখে, আর রুদ্ধশ্বাস ছুটতে থাকে। তখনও ওরা জোর হাসিতে একে অপরের শরীরে ঢলে পড়ছে।

মৃত্যুর আলিঙ্গন

'জন্ম, মৃত্যু, বিয়ে — এ তিন ঈশ্বরকে দিয়ে ।'
অর্থাৎ এ তিন কর্ম ঈশ্বরের ইচ্ছেয় সম্পাদন হয়। বহুচর্চিত প্রবাদটা কতটা বাস্তব, তার অভিজ্ঞতা সবার সমান নয়। সূক্ষ্মভাবে পরিলক্ষিত হলে অনুভবে আসে, উপরোক্ত তিনটি বিশেষ কর্মই শুধু নয়, জীবনে চলার পথের প্রতিটি কর্মসম্পাদনই অনিশ্চিত। এ অনিশ্চয়তা কোন বিশেষ ব্যক্তিত্বের উপর নির্ভরশীল নয়। তার জ্বলজ্যান্ত প্রমাণ আমরা প্রতিনিয়ত দেখছি। তবু নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের জীবন-যাপন বিশেষ ব্যক্তিত্বের উপর নির্ভরতা নিয়েই আবর্তিত। জীবনে প্রতিটি কর্মসম্পাদনের পূর্বেই বিশেষ সতর্কতার প্রয়োজন। তাহলেও বিফলতা আসতে পারে। সে ক্ষেত্রে একটা পরিতৃপ্তি থাকে। নচেৎ অতৃপ্তির গ্লানিতে দুর্বিষহ হয়ে ওঠে মন, প্রাণ। এসব অজ্ঞাত নয় অয়ন কিংবা অরিন্দমের। বিমান থেকে নেমেই স্যুটকেসের জন্যে অয়নের অধীর অপেক্ষা। ঘূর্ণায়মান যন্ত্রটা একবার ঘুরতেই নিজেরটা নামিয়ে নেয়। অথচ দশবার ঘুরবার পরও অরিন্দমের স্যুটকেসটা অদৃশ্য। অরিন্দম দূরে চেয়ারে বসে নির্বিকার। অয়নের চোখে-মুখে বিরক্তি। এক ভদ্রলোক নিজের মনে করে নামিয়ে দেখেশুনে অনেকক্ষণ পর ঘূর্ণায়মান যন্ত্রে রেখে দেন। স্যুটকেসটা পেয়েই অয়নের স্বস্তিবোধ। ট্রলার নিয়ে ঠেলে ফটকের দিকে এগোতে যাত্রীদের একটা জটলা সামনে। জটলার কেন্দ্রবিন্দুতে এক যুবতী। যুবতীর কাতর অনুরোধ বৃত্তে দণ্ডায়মান প্রতিটি যাত্রীর শরীরে অনুরণিত । যুবতীর সর্বস্ব অপহৃত, ফেরৎযোগ্য নগদ অর্থ প্রয়োজন। কৌতূহল নিয়ে সবাই শুনছে । কিন্তু সহায়তা করার জন্য কারও চেষ্টা চোখে পড়েনা। অয়ন ভীড় সরিয়ে ভেতরে ঢোকার উদ্যোগ নিতে দৌড়ে এসে অরিন্দমের বাধা, 'এ্যাই, ভেতরে গিয়ে জড়াবি না ।'

অসহিষ্ণু হয়ে অয়ন কাঁধ থেকে অরিন্দমের হাতটা সরিয়ে দিয়ে বলে, 'একটু খোঁজ নিতে দোষটা কোথায়? একটা অসহায় মেয়ের কাতর অনুরোধ উপেক্ষা করি কী করে?'
'এসব মেয়েদের তুই চিনিস না। এরা সব করতে পারে। অচেনা মেয়ের সঙ্গে জড়ালে বিপদ হতে পারে।'
'জড়াতে যাব কেন? শুনবো কী ঘটেছে। সম্ভব হলে উপকার করবো।'
'তোর যা ইচ্ছা কর! তোর সঙ্গে আসাটাই ভুল হয়েছে!'

কোন উষ্ণ প্রতিক্রিয়া নয় অয়নের। অরিন্দমের কাঁধে হাত রাখে পরম নির্ভরতায়। ওদের কথাবার্তায় ও অয়নের উপস্থিতিতে উৎফুল্ল হয়ে ওঠে যুবতীর মুখ। কিন্তু অনুসন্ধিৎসু প্রশ্নে ওর প্রত্যাশার প্রদীপ দপ করে নিভে মুখটা অন্ধকার। অয়নের কঠোর জিজ্ঞাসা, 'আপনি সব টাকা হাত ব্যাগে রেখে দিলেন?'

'তাহলে আর কোথায় রাখব?'

'আর কোথাও রাখবার জায়গা আপনার জানা নেই?'

'কোথায় আর রাখব? ছেলেদের মত তো আর পকেটে রাখবার সুযোগ নেই!'

'মেয়েদের আবার পকেটের প্রয়োজন কী? কতভাবেই তো রাখা যায়।'

জটলার চারদিকে হাসির রোল। অপমানিত বোধ করে যুবতী। কঠোর প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে বলে, 'বাজে ইঙ্গিত করে ব্যঙ্গ করছেন? অসহায়তার সুযোগ নিচ্ছেন? উপকার করতে না পারেন, একটা ভদ্র মেয়ের বিপদে অপমান করবেন না, প্লীজ।'

'প্লীজ, আমাকে ভুল বুঝবেন না মিস --'

'সাগরিকা।'

'হ্যাঁ, মিস সাগরিকা। আপনাকে অপমান করার কোন ইচ্ছে আমার নেই, সময়ও নেই। আজকের ট্রেনেই আমাকে পাঞ্জাব রওনা হতে হবে।'

'পাঞ্জাব! কোন্ ট্রেনে? হাওড়া-অমৃতসর একস্‌প্রেসে কী?'

'হ্যাঁ, কেন বলুন তো?'

'আমিও ওই ট্রেনে লুধিয়ানা যাব।'

'আই সী! জটলার বাইরে আসুন। ওই দিকটায় বসে সব শুনবো।'

দমদম বিমান বন্দর এ সময়ে বেশ সরগরম। জটলা ফিকে হয়ে আসে। যে যার উদ্দিষ্ট লক্ষ্যে গতিশীল। ওদের নাটকীয় সংলাপ আর প্রস্থানে একেকজনের দৃষ্টি, মন্তব্য, একেকরকম। সমান্তরালভাবে মেয়েটির সাথে এগোতে গিয়ে ঘন্টা তিনেক আগের ঘটনাপুঞ্জ অয়নের স্মৃতিতে ভাস্বর হয়ে ওঠে। ভোর থেকেই আজ ঝির ঝির বৃষ্টি। বৃষ্টিটা একটু দম নিতে ওরা দুজন আগরতলা বিমান বন্দরে। আর এক পশলায় সব উজাড় করে দিয়ে স্তব্ধ। নিরাপত্তা কক্ষে যাত্রীরা অপেক্ষারত। আবার সামান্য পুষ্পবৃষ্টি আর মৃদুমন্দ বাতাস। হঠাৎ বিমানের শব্দে যাত্রীরা সচকিত। কিন্তু সুরেলা কণ্ঠের ঘোষণা, 'খারাপ আবহাওয়ার জন্য আগরতলা বিমান বন্দরে নামার অনুমতি না পেয়ে বিমান কোলকাতার উদ্দেশ্যে ফিরে যাচ্ছে।' কর্তৃপক্ষের দুঃখ প্রকাশ করে অপেক্ষা করার বার বার অনুরোধ।

অপেক্ষারত যাত্রীদের ধৈর্য ফুরিয়ে আসে। শান্ত নিস্তব্ধতা ভেঙে শুরু হয় গুরু গুরু গর্জন। সুস্থিরতা পরিবর্তিত অস্থিরতায়। পরিস্থিতি সামাল দিতে কর্তৃপক্ষের ভেট, চা ও স্ন্যাক্স। কিন্তু সেই নিস্তব্ধতা আর সুস্থিরতা কোথায়? বরং চপলাদের অস্থির ঝলকানিই বেশি। জটলা থেকে অয়নের উদ্ধারকৃত সাগরিকাই ছিল অন্যতমা। কখনও চৌকস ভঙ্গিতে বাকরতা কিংবা হাস্যরতা। কখনও পেছনের শূন্য আসনে শায়িতা। অস্থিরতার সুযোগেই হয়ত অর্থ-সম্পদ হাতছাড়া। সুশ্রী ও নিটোল শরীরের রূপবতী বলেই হয়ত অয়নের চোখে পড়ে।

ওরা গিয়ে এক প্রান্তে বসে। অরিন্দমও খুব একটা দূরে নয় । কিন্তু ওদের পাশে আসার কোন লক্ষণ নেই। মেজাজ নিয়ে মৌজ করে বসে তার একাগ্র লক্ষ্য ওরা দুজন। ওরা বাকরত দীর্ঘক্ষণ। সাগরিকা লুধিয়ানার এক বস্ত্র প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি। যার পোশাকি নাম -- ক্লথ রিপ্রেজেনটিটিভ। সেই সুবাদেই ত্রিপুরাতে আসে। অয়ন একটি পাঁচশ টাকার নোট এগিয়ে ধরে। ঠিক সেই মুহূর্তে অরিন্দম এসে হাজির। সাগরিকা টাকাটা নিয়ে ঠিকানা দিতে পীড়াপীড়ি করে । শেষে অয়ন দিতে বাধ্য হয়। ঠিকানাটা দেখেই সাগরিকার দু'চোখ বিস্ফারিত, 'আপনি এগ্রি-অফিসার ?'

'আমরা দুজনই। এ হচ্ছে বন্ধু অরিন্দম। কয়েকটা প্রজেক্ট দেখার জন্য ত্রিপুরা সরকারের প্রতিনিধি হয়ে আমরা পাঞ্জাব যাচ্ছি ।'

সাগরিকার চোখে সপ্রশংস দৃষ্টি। অরিন্দমের প্রতি করতল জড়ো করতেই সে টেনে নিয়ে নিজের মুঠোতে চেপে ধরে। সাগরিকার মুখে হাসি, ভেতরে সন্দেহের বাতাবরণ। ওকে ছেড়ে ওরা একটু দূরে আসতেই অরিন্দমের বিস্মিত প্রশ্ন, 'একেবারে পাঁচশ টাকা দিয়ে দিলি ?'

'পাঁচশ টাকার কমে হবে কী করে ? এখান থেকে হাওড়ার টেক্সিফেয়ার, দুদিনের ট্রেন জার্নির খাওয়া দাওয়া ---'

'আমাদের ট্যাক্সিতে নিলেই হয়।'

'হ্যাঁ, সে তো হয়। তুই তো বললি, না জড়াতে।'

'টাকা দিয়ে তো জড়িয়েই গিয়েছিস। অমন লাবণ্যময়ীকে পাঁচশ টাকা দেয়া এমন কিছু বেশী নয়।'

'টাকার জন্য শোক, না লাবণ্যের প্রতি লোভ ?'

'টাকাটা যখন দিয়েই ফেলেছিস, তার শোধ তুলতে হবে না ?'

'আমি সুচরিতাকে ফোন করবো।'

'দেখ, সুচরিতা এখনও আমার স্ত্রী নয়, বান্ধবী।' অয়ন মাথাটা ঘুরিয়ে সাগরিকাকে আবার দেখে। ওর নিটোল শরীরে অনবদ্য যৌবনশ্রী। তার বুকের ভেতরটা কেঁপে ওঠে। অরিন্দমকে মনে করিয়ে দেয়, 'মনে রাখিস, তুই একজন সরকারি অফিসার। সরকারি কাজে পাঞ্জাব যাচ্ছিস।'

'তুই একটা ভীরু, কাপুরুষ, নিরামিষ।'

'আমিষ ভালভাবে ডাইজেষ্ট না হলে মৃত্যুতুল্য রোগ হতে পারে।'

অরিন্দমের মুখে হাসি, চোখে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি। সেই দৃষ্টির তাৎপর্য স্পষ্ট নয় অয়নের চোখে। একটা ট্যাক্সিতে সাগরিকাকে নিয়ে ওরা হাওড়ায়। তখনও পূর্বাহ্ন। হাওড়া - অমৃতসর এক্সপ্রেস ছাড়বে একটা পঁয়তাল্লিশ-এ। ওদের এস সেভেন, সাগরিকার এস থ্রি। অনেক ফারাক। ফারাক হলেই বা কী? ট্রেন ঢুকতেই অরিন্দম তার স্যুটকেস হাতে সাগরিকাকে

অনুসরণ করে এস-থ্রির উদ্দেশ্যে। স্তম্ভিত হয়ে অয়ন এস সেভেন-এর রিজার্ভ আসনে গিয়ে বসে। অরিন্দম আসে কিছুক্ষণ পর, শূন্য হাতে।

কৌতূহলী অয়নের জিজ্ঞাসা, 'তোর স্যুটকেস ?'
'সাগরিকার কাছে রেখে এসেছি। একটা যুবতী মেয়ে একা দু'রাতের জার্নি করা'
বাধা দিয়ে অয়নের প্রত্যুত্তর, 'সে তো আমাদের উপর নির্ভর করে অত দূর-দূরান্ত জার্নি করছে না। হঠাৎ আজ অসুবিধা হবে কেন?'
'পরিচয় যখন হয়েই গেছে, তখন একটা কর্তব্যবোধ এড়িয়ে যাই কী করে?'

অয়নের চোখ অরিন্দমের চোখে অনেকক্ষণ ধরে স্থির। সে চোখের ভাষা অরিন্দমের অজানা নয়। হঠাৎ অরিন্দম অয়নের গলা জড়িয়ে ধরে আব্দার করে, 'তুই মাইণ্ড করেছিস কিনা বল। তোর অনুমতি পেলে আমি সাগরিকার কোচে যেতে চাই।'
'মাইণ্ড করবারই কথা। অনুমতি না স্বীকৃতি? কাজটা করার আগে অনুমতি আর করার পর স্বীকৃতি আদায় করে নিতে হয়।'
'প্লীজ অয়ন তুই আমার উপর ভরসা রাখতে পারিস।'
'আমরা বন্ধু ও সহকর্মী। অনুমতি কিংবা স্বীকৃতি কোনটারই প্রয়োজন নেই। একটা কথা মনে রাখিস, তোর কোন ক্ষতি হলে আমারও খুব কষ্ট হবে।'
'বলছি তো বন্ধু, বিশ্বাস রাখতে পারিস।'
'তোর টিকিট হচ্ছে এস সেভেন-এ, তুই এস-থ্রিতে থাকবি কী করে ?'
'টিকিট না কেটেও টিটিকে হাত করে আরামসে জার্নি করা যায়, আর আমি এটুকুন করতে পারব না?'

অয়ন তার ডান হাতটা অরিন্দমের কাঁধে রাখে। মুখের হাসিটা সাবলীল নয়। অরিন্দম যাবার জন্য উদ্‌গ্রীব। স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে থাকলেও চোখে মুখে চঞ্চলতার আভাস। এক সময় বাইরে পা রাখে। কিছুক্ষণ পরেই সব গতিশীল। ঘরবাড়ি, ক্ষেতখামার, মানুষজন, দোকানপাট, গাছপালা সব। প্রকৃতপক্ষে সব স্থিতিশীল আর ট্রেনটাই গতিশীল, মনেই হয় না। নিজে গতিশীল বলেই সব গতিশীল মনে হয়। অরিন্দমকে নিয়ে চিন্তাটা অহেতুক। নিজের ভেতরটা দুশ্চিন্তাগ্রস্ত বলেই ওকে নিয়ে চিন্তান্বিত। অয়নের মনে নেমে আসে গভীর প্রশান্তি।

নিচের বার্থ সাগরিকার। উপরের বার্থ জনৈক অনিল ভার্মার। অরিন্দমের অশেষ অনুরোধেও এস-সেভেনে যেতে তিনি রাজি হননি। সাগরিকা জানালার পাশে বসে। চোখ তার বাইরে, গতিশীল বস্তুর দিকে। অরিন্দম হাঁটু ভেঙে শুয়ে। মাথাটা সাগরিকার কোমর ঘেঁষে। ফিস্ ফিস্ কথা অরিন্দমের। ছোট্ট নিস্পৃহ জবাব সাগরিকার। বাড়াবাড়ি মনে হয় অরিন্দমের।

ভেতরটা জ্বলেও। ওর হাতটা টেনে নেয় নিজের মুঠোতে। কিছুক্ষণ পর সে উঠে বসে, সাগরিকাকে শুতে দেয়। এভাবে পাল্টাপাল্টি করে।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হতে এ দিকের আলো নিভিয়ে দেয় ।

একটা স্টেশনে ট্রেনটা অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে। প্রচণ্ড গরমে যাত্রীদের হাঁসফাঁস। অরিন্দম জানালার পাশে বসে। শায়িতা সাগরিকার মাথাটা তার হাঁটুর উপর। দুজনেরই ফিস্ ফিস্ কথা। উল্টোদিক থেকে দ্রুতবেগে আসা অয়নের ওপর চোখ পড়ে অরিন্দমের। তড়িৎগতিতে সাগরিকাকে ঠেলে সরিয়ে দেয়। অয়ন জানালা দিয়ে দুটো পলিব্যাগ অরিন্দমের হাতে তুলে দেয়। একটাতে একটা আস্ত তরমুজ, চারটে আপেল ও দুটো শশা। অন্যটাতে লুচি-তরকারী ও সেদ্ধ ডিম।

সাগরিকার প্রতি লক্ষ্য করে হাসি মুখে বলে, 'খুব গরম, কষ্ট হচ্ছে ?'

সাগরিকা হেসে উত্তর দেবার আগেই সে এবার অরিন্দমের উদ্দেশ্যে বলে, 'তুই জানালার পাশে বসে হাওয়া খাচ্ছিস ? সরে গিয়ে ওকে বসতে দে ।' পরিস্থিতি লঘু করার অভিপ্রায়ে সাগরিকা হাসিমুখে বলে, 'একা একা দাদার বোধহয় খুব কষ্ট হচ্ছে ?'

হাসি মুখেই অয়নের উত্তর, 'একথাটা স্বার্থপর গর্দভটা বুঝলে কষ্টটা হত না।'

যাত্রীদের ব্যস্ততা শুরু। ট্রেন ছাড়বার অপেক্ষায়। অয়ন দ্রুতবেগে তার কামরার উদ্দেশ্যে ছুটে যায়। অরিন্দম নির্বিকার। ওর শরীরের ওপর দিয়ে সাগরিকা জানালায় চোখ রাখে। উদ্দেশ্য চলে যাওয়া অয়নকে দেখা। চোখে-মুখে ওর বিরক্তি। বিরক্তি নিয়েই বলে, 'ওর খাওয়া হয়েছে কিনা জিজ্ঞেস করতে পারতে ।'

তাচ্ছিল্যের সাথে অরিন্দমের জবাব, 'আরে খেয়েছে। সে সিনসিয়ার ইন অল রেসপেক্টস্। কারও কিছু ভাববার প্রয়োজন নেই।'

রাত এগারোটা। অরিন্দমের চোখে মুখে ঘুম নেই, রোমাঞ্চ। ওর অনুভূতির কেন্দ্রবিন্দুগুলি সাগরিকাকে নিয়ে সরগরম। ট্রেনে ওঠার পর থেকেই নানাবিধ কৌশলে সাগরিকাকে বশে আনে। তার উত্যক্ততায় উত্তেজিত না হলেও ক্রমশ রোমাঞ্চিত। আড়ষ্টতা ভেঙে সাবলীল। সাড়া না দিলেও প্রতিহত করে না।

খাবার নিয়ে অয়নের আগমনের পর থেকেই সাগরিকা বেসামাল। ওর বুকের ভেতরে অন্য অনুভূতি। সে অনুভূতি অয়নের মানবিকতাকে ঘিরে। এমন মানবিক বৈশিষ্ট্যপূর্ণ মানুষের সান্নিধ্যের আকাঙ্ক্ষায় তার মন-প্রাণ আকুলিত।

পরের স্টেশনে ট্রেনটা থামতেই উঠে দাঁড়ায় সাগরিকা। খোঁজ নিয়ে ইতিমধ্যে জানতে পেরেছে, ট্রেনটা এখানে আধঘন্টার মত দম নেবে। অরিন্দমকে ইঙ্গিত করে নেমে পড়ে। পিছু নেয়

অরিন্দম। এস-সেভেনে উঠে এদিক-ওদিক দেখে। অরিন্দম ওকে অয়নের আসনের পাশে নিয়ে আসে। মাঝের বার্থে গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন অয়ন। অরিন্দম ডাকাডাকি করতেই পাহারারত পুলিশের বাধা, 'ওঁকে ডাকবেন না। ঘুমের ট্যাবলেট খেয়ে উনি ঘুমুচ্ছেন। ঘুমটা ভেঙে গেলে ব্যথায় কষ্ট পাবেন।'

সাগরিকা ও অরিন্দম দুজনেই বিস্মিত, 'কেন কী হয়েছে ?'
'এক বন্ধুকে খাবার দিতে গিয়ে ঘটনাটা ঘটে। ট্রেন চলছিল। তাড়াহুড়ো করে উঠতে গিয়ে মাথায় ব্যথা পান। তাঁর পতনোন্মুখ শরীরটা ভেতরের যাত্রীরা ধরে ফেলে। যাত্রীদের মধ্যে একজন আবার চিকিৎসক। ওঁর চিকিৎসায় আর যাত্রীদের শুশ্রূষায় একটু সুস্থ হয়ে ঘুমোচ্ছেন।'

সাগরিকা দৌড়ে গিয়ে অয়নের বুকে কান্নায় ভেঙে পড়ে। পুলিশ অফিসারের ইঙ্গিতে অরিন্দম ওকে তুলে আনে।
'আপনারা ওর কে হন ?' পুলিশ অফিসার জানতে চান।
'ওর দাদা'। সাগরিকাকে দেখিয়ে অরিন্দমের দ্রুত উত্তর।
'ওর বন্ধুটাকে একটু খবর দিতে পারবেন?'
'আমিই বন্ধু, ভগ্নিপতি।' আবার অরিন্দমের উত্তর। যেন তৈরীই ছিল।
কান্নারত নিচু মুখটা তোলে সাগরিকা। অরিন্দমের চতুরতায় বিস্ময়াবিষ্ট। সবার সামনেই জড়িয়ে ধরে একরকম জোর করেই অরিন্দম সাগরিকাকে ট্রেন থেকে নামায়। একটু গিয়েই তীব্র বিরক্তি প্রকাশ করে বলে, 'কী দরকার ছিল আমাদের জন্য খাবার নিয়ে যাবার? নিজের খাবারটাও আমরা কিনে খেতে পারব না? কী ভাবে সে? আমরা তো খেয়েই বিশ্রাম নিচ্ছিলাম।'
'তারপরও তরমুজটা ছাড়া সব খেয়ে নিয়েছো। আস্ত না হলে এটাও সাবার করে দিতে।'
'বাঃ, দাদার ফেভারে চমৎকার বলছো। দাদা নাকি ঈশ্বর?'
'ঈশ্বর না হলেও ঈশ্বরতুল্য। এমন মানুষের সহযাত্রী, বন্ধু, এক হাড় কাঁপানো শয়তান!'
'কী আর করা যাবে। শয়তানের সঙ্গেই জড়িয়ে গেছো।'
'না, তুমি ওর কাছে আজ রাতটা থাকবে। তুমি না গেলে আমি যাব।'
'কারও যেতে হবে না। তোমাকে ছেড়ে আমি থাকতে পারব না।'
'একদিন বাদে থাকবে কী করে?'
'সে তখন দেখা যাবে।'
'তুমি একটা স্বার্থপর, নিষ্ঠুর ও অকৃতজ্ঞ!'
'সবার জন্য নয়।'
'নির্ভেজাল নির্লজ্জ!'

লুধিয়ানা স্টেশনে ট্রেন দাঁড়াবে অনেকক্ষণ। সাগরিকার যাত্রার এখানেই সমাপ্তি। অরিন্দম ফিরে আসবে এস সেভেনে। প্রায় আধঘন্টা ধরে ট্রেন স্থির। এখনও অরিন্দমের দেখা নেই। অয়নও যেতে অসমর্থ। ব্যথাটা এখনও আছে। ভাবনার মাঝেই অরিন্দম উপস্থিত। ওকে দেখে অয়ন বিস্মিত। হাতে স্যুটকেস নেই। জিজ্ঞাসার আগেই সে বলে, 'সাগরিকা লুধিয়ানা নামবে না। অমৃতসর পর্যন্ত ব্যক্তিগত কাজে ওদের সাথে যাবে।'

অয়ন নির্বাক। ওর নির্নিমেষ দৃষ্টি অরিন্দমের চোখে-মুখে, সর্বশরীরে। পরিস্থিতি লঘু করে অরিন্দম সুচতুর হাসে। হাসাহাসি করে অয়নের মুখের রং পাল্টে দেয়। আরও কিছুক্ষণ পর এস-থ্রি'র উদ্দেশ্যে নেমে পড়ে।
অয়নের দু চোখ বার বার কী যেন খুঁজে বেড়ায়।

অরিন্দমের পীড়াপীড়ি, সান্নিধ্য-আকর্ষণে সাগরিকা অবশ। অমৃতসর যেতে রাজী হয়। কিন্তু ঈশ্বরতুল্য অয়নের সামনে গিয়ে দাঁড়াবার সাহস সঞ্চয় করতে পারেনি। ওর ভেতরে একটা অপরাধবোধ। কী পরিস্থিতিতে অমৃতসর যেতে বাধ্য হয়েছে, সে কথা বোঝাবার সুযোগ কোথায়? অয়নের সাথে একটু দেখা করে তার অসুস্থতার খোঁজখবর নেবার অদম্য আকাঙ্ক্ষা প্রাণপণে চেপে রাখতে বাধ্য হয়।

তৃতীয়দিন সকাল দশটায় অমৃতসর পৌঁছে ট্রেনটা স্থায়ীভাবে দম ছেড়ে দাঁড়িয়ে পড়ে। রেলওয়ে রেষ্টহাউসে শীততাপ নিয়ন্ত্রিত দুটি বেডের একটি ঘর নেয় ওরা। এখানকার তাপমাত্রা অধিক। ত্রিপুরাবাসীর কাছে অসহনীয়। অয়নের ভেতরটায় একটা অতৃপ্তি। সাগরিকা যাবার আগে একটিবার দেখাও করেনি। কৃতজ্ঞতার কথা নয়। উপকৃত হবার জন্যও নয়। স্বল্প পরিচয়েও আন্তরিকতা থাকে। নিদেনপক্ষে ভদ্রতাবোধ।

সব কাজে অরিন্দমের ব্যস্ততা, দ্রুততা ও অস্থিরতা। ধন্দে পড়ে অয়ন। তার অনিশ্চয়তার কুয়াশা দূরীভূত অরিন্দমের কথায়, 'তুই বিশ্রাম কর। আমি আসছি।'
'কখন প্রজেক্ট দেখতে যাবি?'
'আজ নয় অয়ন, প্লীজ। আজ বিশ্রাম নেব। কাল থেকে ফ্রেশ হয়ে একমনে কাজ শুরু করবো।'

অয়নের ভেতরের অস্বস্তিটা বাড়তে থাকে। আজ স্থানীয় প্রজেক্ট, আগামীকাল থেকেই বাইরের প্রজেক্ট দেখবার কথা ছিল। সরকারী কাজ ছাড়াও ভেতরময় অন্য অস্থিরতা। অরিন্দমের দ্রুত প্রস্থানে সে অস্থিরতা ত্বরান্বিত। পিছু নেয় সে ত্বরান্বিত অস্থিরতা নিয়েই।

মহিলা বিশ্রাম কক্ষের সামনে অরিন্দম সাগরিকার মুখোমুখি। দুজনের মুখেই হাসি। সচল ঠোঁট। হাতে হাত। মুহূর্তে ওরা গতিশীল। সেই গতিশীলতা ট্যাক্সি-স্ট্যান্ডের দিকে। একটা ট্যাক্সিতে উঠে দ্রুত অদৃশ্য হয়ে যায় তারা। খোঁজ নিয়ে জানতে পারে, এটা স্বর্ণমন্দিরে যাবার পথ। অয়নের হঠাৎ অভিমান হয়।

রহস্যময় নারী মন। কথাটা মনে হতেই মস্তিষ্কে তীব্র আলোড়ন। অভিমানের ভাবাবেগে যুক্তিবাদের তীব্র আঘাত। সংশোধিত হয় আবেগ-তাড়িত মন। সুচরিতা তার প্রেয়সী শুধু নয়, প্রাণাধিকা। প্রতিদিন ওদের সাক্ষাৎ সূর্যোদয়ের মত অনিবার্য। তন্বী, সুনয়নী সুচরিতাও ওর জন্য আত্মহারা। একবার ট্যাক্সি নিয়ে এসে পাঁচ মিনিটের জন্য সুচরিতার সাথে সাক্ষাৎ ঘটেনি। ইউনিভারসিটি হস্টেল বন্ধ। কান্নায় ভেঙে পড়েছিল অরিন্দম। সেই অরিন্দম আজ সাগরিকার প্রেমে হাবুডুবু। হতে পারে সাগরিকা অসম সুন্দরী। কিন্তু সুচরিতার নিষ্পাপ শুদ্ধ প্রেম তার উগ্র কামনার বহ্নিকে নিবৃত্ত করতে পারেনি। রহস্যময় নারী মন নয়, মানুষের মন। উন্নত মস্তিষ্কের জন্যে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জীব মানুষ। কুহেলিকা ঘেরা সেই মানুষের ভেতরটা অদৃশ্য, চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য অজ্ঞাত, অনিশ্চিত তার অস্থির মনের গতিপথ। সে জন্যই মানুষ মানুষের চির অচেনা।

অয়নের বুকের ভেতরের অভিমানের জগদ্দল পাথর যুক্তিবাদের উষ্ণতায় দ্রবীভূত। মুক্ত মন নিয়ে ঘরে ফিরে আসে। একাগ্রতা নিয়েই প্রজেক্ট রিপোর্টের কাগজ তৈরীতে ব্যস্ত হয়। অধিক উষ্ণতা থেকে এসে কক্ষের শীততাপ নিয়ন্ত্রণে তন্দ্রায় ঢলে পড়ে। অবিরাম কড়া নাড়ার শব্দে আবার জেগে ওঠে। দরজা খুলতেই কেয়ার টেকারের দ্রুত জিজ্ঞাসা, 'ক্যায়া সাব, আপ ত্রিপুরাসে আয়ে হ্যায়?'

'সহি, লেকিন কিউ?'

'আপকা টেলিফোন।'

এক নিঃশ্বাসে দৌড়ে গিয়ে অয়ন রিসিভারটা তোলে, 'হ্যালো কহিয়ে আপন কৌন হ্যায়?'

'আরে ধ্যাৎ, হিন্দীকা বাচ্ছা। অরিন্দম বলছি। অয়ন তুই খেয়ে নে, আমার ফিরতে দেরী হবে।'

'তুই ফিরবি কিনা স্পষ্ট করে বল।'

'না ফিরলে চিন্তা করিস না। ভোরেই আসছি। আটটার মধ্যেই প্রজেক্ট প্লেসের উদ্দেশ্যে রওনা হব।'

'হোটেলের নাম, টেলিফোন নাম্বার বল! কোথায় সেটা বল!'

'হোটেলের নাম মধুচন্দ্রা।'

দূরভাষ বিচ্ছিন্ন। অয়ন গজরাতে থাকে মনে মনে, মধুচন্দ্রা না নরকগন্ধা!

আবার ভাবাবেগে বিদ্ধ হতেই সতর্ক। বাম হাতের কব্জিটা ঘুরিয়ে দেখে, নয়টা বাজতে দশ। সন্দেহ হতেই দেয়াল ঘড়িতে চোখ রাখে। হঠাৎ মনে পড়ে, এখানে সন্ধ্যা মানেই সাতটা। সেজন্যেই এখনও সরগরম।

শোবার পর অনেকক্ষণ ঘুম আসে না। আসে প্রায় শেষ রাতে। সেজন্যেই পরদিন ঘুম থেকে

উঠতে দেরি হয়। প্রায় ঘন্টাখানেক ধরে চলে প্রাত্যহিক কাজ। স্নান সেরে বেরুতে, আটটা কুড়ি। আরও চল্লিশ মিনিট অধীর অপেক্ষা। দেয়াল ঘড়ির টিকটিক শব্দ যেন হৃৎপিণ্ডে হাতুড়ির আঘাত।

রেল চত্বর ছাড়ালে অটো রিক্সার আড্ডা। হোটেলের নাম বলতেই এক চালক যাবার জন্য তৈরী। সম্ভবত নামী হোটেল। মন্দির মার্গের মাঝামাঝি গিয়ে একটা সুদৃশ্য হোটেলের সামনে দম ছাড়ে অটো। নানা ভাষায় লেখা — হোটেল মধুচন্দ্রা।

ম্যানেজারকে জিজ্ঞাসা করতেই রেজিষ্টারে চোখ রাখে। পেছনের দেয়ালের ছবি দেখিয়ে বলে, দুশ তের। একতলায় একশ দিয়ে শুরু। ছ'তলায় ছ'শ দিয়ে। ঝকঝকে চমৎকার পরিবেশ।

সব কক্ষই ভেতর থেকে বন্ধ। কিন্তু দু'শ তেরর দরজায় একটু ফাঁক। ডোরবেলের শব্দেও কেউ আসে না। ভেতরে ঢুকতে অস্বস্তি অয়নের। এগিয়ে গিয়েও ভেতরের বিসদৃশ দৃশ্যের কথা অনুমান করে পিছিয়ে আসে। দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষা। হঠাৎ মনে হল, ভেতরে কান্নার শব্দ। অয়নের বুকের ভেতর হাতুড়ির আঘাতের পর আঘাত। দরজা ঠেলে ঢুকেই অয়ন বিস্ময়াবিষ্ট। হাঁটু ভেঙে উপুড় হয়ে অরিন্দম ফুপিয়ে কাঁদছে। তার শরীরটা কেঁপে কেঁপে উঠছে । সাগরিকা নেই। স্নানঘরের দরজা বাইরে থেকে বন্ধ।

একটা অজানা ভয়ে তার ভেতরটা চূর্ণবিচূর্ণ। এগিয়ে গিয়ে অরিন্দমকে জড়িয়ে ধরে। ফুলে ফুলে ওঠা ক্রন্দনরত শরীরটাকে জোর করে ওঠাতে ব্যর্থ হয়। অয়নের নিরন্তর পীড়াপীড়িতে অরিন্দম ডান হাতের মুষ্টিবদ্ধ করতল ওর মুখের সামনে খুলে ধরে। দুমড়ানো মোচড়ানো এক খণ্ড কাগজের পুটলি থরথর কেঁপে উঠছে। অয়ন তুলে নিয়ে পরিপাটি করে দুচোখের সামনে মেলে ধরে। তার বিস্ফারিত দুচোখ যেন ঠিকরে বেরিয়ে আসতে চাইছে। শরীরের সমস্ত অস্থি-সন্ধিতে তীব্র ঝংকার। ঝংকারের তীব্র আলোড়নে সন্ধিস্থানগুলি যেন শরীর থেকে বিচ্ছিন্ন। বুকের ভেতরে একটা ব্যথার তীব্রতা তাকে নিঃশেষ করতে থাকে। তীব্র অসহনীয় ব্যথা নিয়েই অয়ন দ্রুতগতিতে পড়াটা শেষ করে। শোকে-দুঃখে-ভয়ে আর অসহ্য মর্মদাহে তার শরীরটা যেন প্রস্তর মূর্তি। সেই পাষাণ মূর্তির দুচোখ সচল হয়ে দুমড়ানো পত্রটার প্রথম শব্দ থেকে আবার গতিশীল হয়, —

> প্রিয় সুহৃদ অরিন্দম,
> বিশ্বের ত্রাস অসংগঠিত সদস্যদের এইডস সংঘের নবীনতম সদস্য হিসাবে তোমাকে সুস্বাগতম। ভয়ংকর-বিধ্বংসী এ সংঘের সদস্য হিসাবে তোমার নাম ঘোষণা করতে আমার বুকের ভেতরটা ভেঙে তছনছ। এ মর্মদাহ তোমার জন্যে নয় । তোমার পরম বন্ধু, আমার ঈশ্বরতুল্য দাদা অয়ন আর তোমার মানিব্যাগে রাখা ফটোতে দেখা তোমার প্রেয়সী সুচরিতার জন্য। আমার নিরন্তর বাধা তোমার সীমাহীন চরম কামুকতা

ও লাম্পট্যের কাছে পরাস্ত। এতে আমার কোন দুঃখ নেই। সুদর্শন আর সুশিক্ষিত পুরুষের শরীরে এ ভয়ংকর বিষ প্রবাহিত করাই আমার উদ্দেশ্য। স্বার্থপর হলেও তুমি আমার লৌকিক ঈশ্বরের বন্ধু। সেজন্যেই নানাভাবে তোমাকে এড়িয়ে যাবার প্রাণপণ চেষ্টা ছিল। তথাকথিত সর্বশক্তিমান অলৌকিক ঈশ্বরের অস্তিত্ব আমার কাছে হাস্যকর। কিছু মানুষরূপী পিশাচ যখন আমার নিষ্পাপ কোমল শরীরে জোর করে বিষ ঢালছিল, কোথায় ছিল সর্বশক্তিমানের অস্তিত্ব, ক্ষমতা ও ন্যায় বিচারের হস্তক্ষেপ? কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারী শুধু নয়, দেশের প্রতিটি অঞ্চলে আমার অবাধ বিচরণ। আমার একমাত্র লক্ষ্য, লক্ষ কোটি পুরুষকে এ বিষে জর্জরিত করে প্রতিশোধ নেয়া। আমার লৌকিক ঈশ্বরের সান্নিধ্যে আমি স্তব্ধ, লক্ষ্যভ্রষ্ট, অনুশোচনায় দগ্ধ।

আমার কাছে তোমার দেয়া অঢেল অর্থ। সেই অনাচারী অর্থে ঈশ্বরতুল্য মানুষের নিঃস্বার্থভাবে দেয়া ঋণ পরিশোধ করতে চাই না। কষ্টার্জিত অর্থ দিয়েই হবে ঋণ পরিশোধ। জ্ঞান-বিজ্ঞানে উন্নত এ চমৎকার পৃথিবী ছেড়ে কে যাবে আগে ? আমি না তুমি? কার শরীরে প্রতিরোধ ক্ষমতা বেশী কে জানে? বিদায় বন্ধু ! আমাকে খুঁজতে যেয়ো না। ইতি —

তোমার
সাগরিকা।

ছেঁড়া পাতার কথা

নন্দিনী জানালাটা খুলতেই অপেক্ষারত আলোকরশ্মি সুযোগসন্ধানীর মত হুমড়ি খেয়ে পড়ে। আলোক উজ্জ্বল কক্ষ। কিন্তু ওর চোখে সব ঝাপসা, অন্ধকারময়। অতর্কিত সূর্যালোকের তীব্র তেজে দুচোখ অন্ধ। কুঞ্চিত চোখ ব্যবহৃত শাড়ির আঁচলে চাপা পড়ে তৎক্ষণাৎ। মুহূর্ত মাত্র। ধীরে ধীরে সব স্পষ্টতর।

কুড়িটি বিনিদ্র রজনীর পর গভীর ঘুমে তলিয়ে যায় নন্দিনী। দিনের পর দিন অনিদ্রায়, অনাহারে, স্বল্পাহারে, অনিশ্চিত ভবিষ্যতের দুশ্চিন্তায় শরীর-মন ছিল বিপর্যস্ত। অস্থির জীবনে হঠাৎ নাটকীয় সুস্থিরতা। অর্থনৈতিক সুস্থিরতায় অন্ন বস্ত্র ও বিলাসের দুশ্চিন্তা নেই কিন্তু মনের দাবী মেটেনা। মনের দাবী না মিটলে আহার নিদ্রার ব্যাঘাত ঘটে। শরীর মন দীর্ঘ খরায় ফেটে চৌচির উর্বর জমির মত।

সামাজিক মর্যাদা নিয়ে মধ্যবিত্তের সুখী সংসার নন্দিনীর। স্বামী বিশ্বেশ্বর চৌধুরী পদার্থবিদ্যার নামী শিক্ষক। আংশিক সময়ের অধ্যাপকও। সব ছাড়িয়ে অন্য একটা ভুবন নিয়ে তিনি বিভোর, আত্মহারা। সে ভুবনের বার্তা জেলা সদর ডিঙিয়ে রাজ্যের অন্তে-প্রান্তে আছড়ে পড়ে। তৈবি হয় তার এক বিশেষ শ্রেণীর গুণমুগ্ধ পাঠক। সপ্রশংস তীক্ষ্ণ নজর রাজ্যের সাহিত্য ও শিল্প জগতের মানুষের। তার রচিত কবিতা ভিন্ন জাতের, অন্য স্বাদের। রাজধানীর অত্যুত্তম পাঠক-পাঠিকা কর্তৃক গৃহীত ও প্রশংসিত।

কপাটের দু'পাল্লা দুদিকে সরিয়ে বাইরে পা রাখতেই নন্দিনীর মুখোমুখি রশ্মি। হাতে চা, মুখে বিষণ্ণতা। হরিণার দাসপাড়ার মেয়ে 'টেমি'র এ বাড়িতে নতুন নামকরণ রশ্মি। রশ্মির চোখমুখ আলোকিত। বিশ্বেশ্বর নিজেও রোমাঞ্চিত। রাশভারি বিশ্বেশ্বরের হাসি, তামাসা, মানসিক অবসাদ কাটাবার উৎস, রশ্মি। ছোট্ট রশ্মি যেন এ বাড়ির পরিচারিকা নয়, আদরের নাতনি। কন্যার অনুযোগ, 'রশ্মি নয়, এ বাড়ির পরিচারিকা আমিই। বাপির মনপ্রাণ জুড়ে রশ্মি। বাপির সব কথা রশ্মির সঙ্গে। মামণিও উপেক্ষিতা। সুন্দর মুখের জয় সর্বত্র, এমনকি বাপির কাছেও। রশ্মির গায়ের রং আর পোষাকের সঙ্গে মিলিয়ে বাপি নামটাও রেখেছে চমৎকার।'

হো হো করে বিশ্বেশ্বরের প্রাণখোলা হাসি। হাসি থামিয়ে কৈফিয়ৎ দেন, 'শোনো, মেয়ের কথা! রশ্মি তার বৈশিষ্ট্যের জন্যেই সুন্দর। তোরা আমাকে ভয় পাস, রশ্মি পায়না। তোরা কথা বলিস ভেবে-চিন্তে, কায়দা করে, রশ্মি অকপটে। তোদের মামণি কাছে আসে সমস্যা নিয়ে, আর রশ্মি কাছে বসে শুধু অনাবিল হাসিতে । আর নাম ....'

ঠোঁট বেঁকিয়ে কপট রাগ দেখিয়ে নন্দিনীর ঘোষণা, 'আদরের নাতনিকে কাছে বসিয়ে অনাবিল হাসিতে কবিতা রচনা করো।'

'আহা, আমার কথাতো শেষ হয়নি, কথার মাঝে ফোঁড়ন কাটা ঠিক নয়।' বিরক্তি প্রকাশ করেন বিশ্বেশ্বর।

'আমি কবি-সাহিত্যিক নই, গুছিয়ে একসাথে কথা বলতে পারিনা। ভুলে যাবার ভয়ে মাঝ পথে বলতে বাধ্য হই।'

বুদ্ধি খাটিয়ে নন্দিনীর দ্রুত প্রত্যুত্তরে বিশ্বেশ্বর অতিশয় তৃপ্ত। এবার কন্যার অনুযোগের সূত্রে সংযোগ করেন, 'নামের কথা বলছিস? তোর নাম সপ্তপর্ণা, ডাক নাম পর্ণা। ভাইয়ের নাম অন্তরীপ, ডাক নাম অন্ত। তোর মামণিতো নন্দন কাননের নন্দিনী। সবইতো চমৎকার। তোর ছোটবেলার ফ্রক তাকে দিয়েছে তোর মামণি। তার সৌন্দর্যের পেছনে আমার তো কোন ভূমিকা নেই!'

রশ্মিকে এড়িয়ে নন্দিনী এগোতে থাকে। পুত্র ও কন্যা যে যার কাজে ব্যস্ত। নিশ্চিন্ত হয়ে হাত মুখ ধোয়। ফিরে এসে চায়ের পেয়ালা হাতে নেয়। উপরে উঠে ঠোঁটের স্পর্শে আর আসেনা। নিস্তব্ধতা পুরো বাড়িটাতে। রাতভর বৃষ্টির পর আকাশ পরিচ্ছন্ন। দূর থেকে মনসা মঙ্গলের গীতে পরিচিত সুরে অন্তর উদ্বেলিত। মনে পড়ে ফেলে আসা জীবনের কথা, আপন জনের বিরহ বেদনার জ্বালা। নিঃসঙ্গ জীবনে কোন কিছুই সাবলীল মনে হয়না। ভেতরটা গুমরে কাঁদে। একটা মানুষের অনুপস্থিতিতে সংসারটা থমকে যায় বারবার। ঠেলে সচল করতে হয়। অথচ মানুষটার উপস্থিতিতে হাজারো অনুযোগ, নিজেকে নিয়েই ব্যস্ত, সংসারের প্রতি উপেক্ষা ইত্যাদি। সেই অসতর্ক, অসচেতন মানুষটার উপস্থিতিই ছিল যথেষ্ট। তার উপস্থিতিকে কেন্দ্র করেই যে যার কার্যক্ষেত্রে ছিল গতিশীল। নিজে কিছু করবার প্রয়োজন নেই। আজ সন্তানরাও এক অজ্ঞাত কারণে এক অচেনা পথের যাত্রী। সবার মন সন্দিগ্ধ। সন্দিগ্ধ সম্পর্ক নিয়েই খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলছে এ সংসার।

এ শহরের অনতিদূরে এক অখ্যাত গ্রামের ছেলে বিশ্বেশ্বর চৌধুরী। মেধাবী ছাত্র। মধ্যবিত্ত ব্যবসায়ীর পুত্র। গ্রাম ছেড়ে শহরে পড়তে এসে সবার চোখে পড়ে। উচ্চ মাধ্যমিক পাশ করার পর মহারাজা বীরবিক্রম মহাবিদ্যালয় থেকে পদার্থবিদ্যায় কৃতিত্বের সাথে সাম্মানিক ডিগ্রি। কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হতেই নন্দিনীর পিতা বিপিনবাবুর চোখে পড়ে। বিপিনবাবু ধনাঢ্য ব্যক্তি। সৎ মানুষ হিসেবেও সুপরিচিত। নন্দিনীর শিক্ষা শেষ না হতেই পাত্রস্থ করবার সিদ্ধান্ত। শিক্ষা শেষ হলে অমন পাত্র জুটবে কিনা তার কোন নিশ্চয়তা নেই। প্রভাব প্রতিপত্তি খাটিয়ে বিশ্বেশ্বরের পিতার সম্মতি আদায় করেন তিনি। পিতার একান্ত অনুগত, বাধ্য বিশ্বেশ্বর। ভেতরে অসম্মতি নিয়েও জ্ঞাপন করতে পারেনা। চারদিকে জোর সমালোচনা, বিশ্লেষণ, এ বিয়ে সুস্থির হবার নয়। এমন প্রতিভাধর ছেলের জন্যে মাত্র উচ্চমাধ্যমিক উত্তীর্ণ মেয়ে!

নন্দিনীর দুশ্চিন্তার অন্ত নেই। পক্ষান্তরে আত্মীয়, গুরুজন, প্রতিবেশি নন্দিনীর সৌভাগ্যে সুপ্রসন্ন। ওর হৃদয়ের ব্যাকুলতার কথা ব্যক্ত করবার তেমন আন্তরিক কেউ নেই। রক্ষণশীল পরিবারের কঠোর শৃঙ্খলিত জীবন ওর। মহা ধুমধামে বিবাহের ক্রিয়াকর্ম সুসম্পন্ন। বিশ্বেশ্বরের কোন উৎফুল্লতা নেই। কথা প্রসঙ্গে প্রকাশ্যেই ব্যক্ত করে। পিতার আদেশ তার কাছে সবার ঊর্ধ্বে। তবে কোন অবজ্ঞা, উপেক্ষাও নেই।

এদের পরিবারটা একদিক থেকে অনন্যসাধারণ। অবজ্ঞা, উপেক্ষা এ বাড়ির ত্রিসীমানায় নেই। সব আলোচনা খোলামেলা। সবার চোখের মণি বিশ্বেশ্বর। কোন ব্যাপারে তার কথাই চূড়ান্ত। সবার পরম আকাঙ্ক্ষা তার মুখের একটু হাসি। দুরু দুরু বুকে নতুন বধূ হয়ে এ বাড়িতে আসে নন্দিনী। একাধিক ভয় মনে। দিদি-বৌদিদের সাবধান বাণী, 'বিশ্বেশ্বর গুণী ছেলে। সাহিত্যিক জগতে তার বিচরণ। শিল্পী-সাহিত্যিকদের একটা নেশা থাকে। কোন ব্যাপারে দুর্বলতাও। স্বভাব চরিত্রের ক্ষেত্রেও ঢিলেঢালা। গুণী মানুষদের স্ত্রীদের এসব মেনে নিতে হয়।' নন্দিনী নিশ্চুপ, প্রতিক্রিয়াহীন। তার ভেতরে প্রেম-ভালবাসার বীজ তখনও অঙ্কুরিত হতে শুরু করেনি। এত সূক্ষ্ম ব্যাপার তার মস্তিষ্কে নেই। তার মস্তিষ্ক জুড়ে ভয়াবহতা। বিশ্বেশ্বরের কাছে সে কীভাবে গৃহীত হবে!

বাসর রাত থেকেই নন্দিনীর ভালবাসার বীজ অঙ্কুরিত। বিশ্বেশ্বর এক অসাধারণ চরিত্রের মানুষ। এমন অদ্ভুত মানুষের কথা সে স্বপ্নেও কখনও ভাবেনি। বাইরেটাই শুধু কঠোর। তার জীবনের প্রধান বাণী, সততা। শেষ কথা শৃঙ্খলা। ভেতরে প্রতিটি মানুষের জন্যে অসীম মমত্ববোধ। সাহিত্যিক কিন্তু আড্ডাবাজ নয়। পিতার আজ্ঞা শিরোধার্য করে কখনও চায়ে চুমুক দেয়নি। পানাসক্ত হবার সম্ভাবনা কোথায়!

নন্দিনীর ভালবাসার বীজ শুধু অঙ্কুরিত নয়, শাখা-প্রশাখা বিস্তার করে দিগন্ত স্পর্শ করতে চাইছে। বিশ্বেশ্বর তার শরীরের প্রতিটি কোষে কোষে বিরাজিত। সুখানুভূতি হৃদয় মন জুড়ে। প্রতি মুহূর্তে বিশ্বেশ্বরকে হারাবার ভয়। শৃঙ্খলাময় জীবন বিশ্বেশ্বরের। স্ত্রীকে ভালবাসে, আদর-যত্ন করে। কিন্তু নববধূর সান্নিধ্যের উচ্ছ্বাসে ফেটে পড়েনা। ভেতরটা সন্দিগ্ধ হয়ে পুড়তে থাকে নন্দিনীর। তবে কি তার দুর্বলতা ....। ভাবতে পারেনা নন্দিনী। ভাবতে চায়ও না সে। মধ্যরাতে বিশ্বেশ্বরকে জড়িয়ে ধরে কেঁদে ওঠে বারবার। পরম আবেগে বুকে চেপে ধরে বিশ্বেশ্বর।

পরদিন বাপের বাড়িতে পাঠিয়ে দেয়। নন্দিনীর অস্বস্তি আরও বাড়ে। তার মনের প্রতিক্রিয়ার বিপরীত প্রতিবিধান। অনাকাঙ্ক্ষিত বিচ্ছেদ। পিতার স্নেহ, মায়ের আদর, দাদার যত্ন, বৌদির খুনসুটি সব ভাল। কিন্তু সব ছাড়িয়ে স্বামীর সান্নিধ্য সুখের আকাঙ্ক্ষায় উতলা নন্দিনী। সপ্তম দিনে নয়, দ্বিতীয় দিনেই ফিরে যাবার কথা ব্যক্ত করে বৌদিকে। বৌদির চোখ কপালে, 'কিরে ! সাত দিন বলেছে, দশদিন থাকবি। নিজে যাবি কেন? সে এসে নিয়ে যাবে।'

'বৌদি, ওর কষ্ট হচ্ছে। সব কিছু ওকে এগিয়ে দিতে হয়। নতুবা বিরক্ত হয়।'

'তুই জানলি কী করে? টেলিফোন করেছে বুঝি?'

'টেলিফোন করেনি। এ কয়দিনে আমি সব দেখছি না?'

'বিয়ে হয়েছে এক মাসও হয়নি। এতদিন কে করেছে?'

'এতদিন মা এগিয়ে দিয়েছেন, সব খোঁজ খবর নিয়েছেন। এখন নেবে কেন?'

'তোর শাশুড়ি বুঝি এরকম?'

'না, না, আমি সে কথা বলছিনা। ওরা সবাই খুব ভাল।'

'তাহলে ওর কষ্ট নয়, কষ্ট হচ্ছে তোর!'

'কষ্ট হবেনা কেন? স্বামীর জন্যে স্ত্রীর কষ্ট হবেনা তো কার হবে?' বাঁ হাতের তর্জনীতে শাড়ির আঁচল জড়াতে জড়াতে বৌদির চোখ থেকে দৃষ্টি সরিয়ে বলে নন্দিনী।

বৌদি খুঁটিয়ে দেখে তাকে। নন্দিনীর নিচু শির, গম্ভীর মুখ। বৌদি ওর চিবুকটা তুলে ধরে বলে, 'হঠাৎ তোকে একটু বেপরোয়া মনে হচ্ছে। তুইতো এমনভাবে কথা বলিসনি কখনও। কষ্ট করে দশদিন থাক। সে জ্বলুক, তুই জ্বলবি কেন? তারপর পায়ে ধরে নিয়ে গিয়ে মাথায় তুলে রাখবে।'

'বৌদি আমি ওকে ছাড়া অতদিন থাকতে পারবনা।'

'খুব পারবি। আমি শিখিয়ে দেব সব কায়দা কানুন।'

হঠাৎ নন্দিনী ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে। বৌদিকে জড়িয়ে ধরে অঝোরে কাঁদতে থাকে। ভ্যাবাচ্যাকা খায় বৌদি। বুকে জড়িয়ে ধরে মাথায় পিঠে হাত বুলিয়ে দেয়। কিছুক্ষণ পর শান্ত হয়ে নন্দিনী বলে, 'আমি ওকে ছাড়া বাঁচবনা। কালই আমি ফিরে যাব। তুমি সব ঠিক করে দাও।'
আড়ালে মুচকি হেসে বৌদির সান্ত্বনা। পরদিনই দূরভাষে বৌদির জরুরি আহ্বান। বিশ্বেশ্বর আসে তড়িঘড়ি। তার মনে গভীর উৎকণ্ঠা। সব শুনে বিস্মিত। মা,বাবা, দাদার অতৃপ্তি। মাত্র দু'রাতের পরই নন্দিনী ফিরে যাবে? বিশ্বেশ্বরের মুখে কোন কথা নেই। বৌদিই মুখপাত্রী। চোখের জলে বিদায় দেয় মা, বাবা, দাদা। ওরা যেতেই বৌদি মুখ খোলে। মুখ টিপে হেসে জানায়, 'বিশ্বেশ্বর নয়, নন্দিনীই যেতে উদগ্রীব।' শুনে ওদের চোখে জল, মুখে হাসি। জামাতার ধৈর্যে গর্বিত। কন্যার সুখে আত্মহারা। পরে নন্দিনী জানতে পেরে মরমে মরে গিয়েছিল, কী লজ্জার কথা!

বিশ্বেশ্বরের গুণমুগ্ধ নারীর সংখ্যা নেহাৎ কম নয়। বালিকা থেকে প্রৌঢ়া পর্যন্ত। অসংখ্য চিঠি বিয়ের আগের ও পরের। ওর কোন গোপনীয়তা নেই। জীবনের প্রতি পদক্ষেপেই সরলতা। সূক্ষ্ম বিচার বিশ্লেষণ করেও নন্দিনী হতাশ। কোন দুর্বলতাই চোখে পড়বার নয়। নন্দিনীকে নিয়ে বিশ্বেশ্বরের উচ্ছ্বাস নিরবচ্ছিন্ন নয়। কখনও যেন নীলাকাশে পুষ্পক রথে বিচরণ, আবার কখনও পাশাপাশি থেকেও বিপরীত মেরুর মত বিকর্ষিত। প্রথম কয়েক বছর এমন

বিপরীতধর্মী বৈশিষ্ট্যে নন্দিনী আশাহত, অতৃপ্ত। পরস্পরকে গভীরভাবে জানবার পর ওর উচ্ছ্বাস নির্মল। এ এক বিস্ময়কর উপলব্ধি নন্দিনীর। সাহিত্যিক স্বামী মাত্রই এমন বৈশিষ্ট্যের কিনা সে বুঝতে পারেনা।

সাহিত্যিক স্বামীকে নিয়ে অন্য ভয় নন্দিনীর। সেই আশঙ্কার কথা মনে হতেই তার হৃদস্পন্দন যেন থমকে দাঁড়ায়। শরীরের রক্ত হিম হয়ে আসে। খুঁটিয়ে চোখ মুখ দেখে স্বামীর। কোন অস্বাভাবিকতা চোখে পড়েনা। ভেতরটা মোমের মত নীরবে পুড়তে থাকে। সেই ভয়াবহ ব্যাপারটা, নিরুদ্দেশ। অন্য কারও নিরুদ্দেশ নয়, বিশ্বেশ্বরের নিজের নিরুদ্দেশ। কোন আনন্দঘন সুখকর মুহূর্তে নিরুদ্দেশের কথা। সুখের মুহূর্তের দিক পরিবর্তন। সুখানুভূতির ছন্দপতন! নন্দিনী স্বামীর বুকে উপুড় হয়ে দৃঢ়তার সাথে জিজ্ঞাসা করে, 'তুমি এসব বলো কেন? আমার একদম ভাল্লাগেনা।' উঠে বুকে টেনে নিয়ে বিশ্বেশ্বর চেপে ধরে। বুকের ভেতরটা যেন উথাল-পাথাল। কয়েক ফোঁটা অশ্রু বিশ্বেশ্বরের চিবুক বেয়ে নন্দিনীর শরীরে গড়িয়ে পড়ে। নন্দিনী বিস্ময়ে বিমূঢ়। গভীর উৎকণ্ঠায় নন্দিনীর অসংখ্য প্রশ্ন। তবুও নির্বাক বিশ্বেশ্বর। শুধু স্ত্রীর মুখের দিকে একাগ্র গভীর দৃষ্টি।

দু'একবার নয়, অসংখ্যবার নিরুদ্দেশের কথা। নন্দিনী সহজ হলেও শিরদাঁড়ায় একটা ভয়ের শীতলতা। কিন্তু চেপে ধরে ওকে আর পীড়াপীড়ি করেনা। স্বামীর অশ্রুধারায় সে আহত হরিণীর মত ছটফট করে। ছোট্ট শিশুর মত ওর মাথাটা টেনে এনে বুকে চেপে ধরে পিষে পিষে ভেতরের সব কষ্ট, অসঙ্গতি প্রশমিত করতে ইচ্ছে করে। ইচ্ছে থাকলেও উদ্যোগী হতে পারেনা। শিক্ষা-সংস্কৃতির একটা বিশাল ব্যবধান বাধা হয়ে দাঁড়ায়। স্বামী হলেও। যার মেধা, শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা আকাশের মতো বিশাল, সীমাহীন — এমন মানুষ নন্দিনীর স্বামী, প্রভু, ঈশ্বর। পরম নির্ভরতা আর সর্বসুখের আশ্রয়স্থল। এমন স্বামীর চোখের অশ্রু বেমানান, বিসদৃশ ও অনভিপ্রেত শুধু নয়, নন্দিনীর কাছে চরম বেদনাদায়ক। সেজন্যেই নন্দিনী হৃদয় অভ্যন্তরের ধিকি ধিকি জ্বালা নিয়ে নির্বাক ও প্রতিক্রিয়াহীন।

সে আশঙ্কা একদিন বাস্তবে পরিণত হবে, নন্দিনীর কাছে তা ছিল স্বপ্নাতীত। দলা পাকিয়ে ভেতরের কান্না চেপে রাখতে তার প্রাণপণ চেষ্টা। ভাবনার এখানে অপ্রত্যাশিত বিরতি।

ত্রয়োবিংশ বিবাহ-বার্ষিকীর সুপ্রভাত। অনেক আদর্শ স্বামীর মত বিশ্বেশ্বরও অসচেতন। কিন্তু নন্দিনীর জীবনে এ বিশেষ দিনটি স্মরণীয়। ধ্রুবতারার মত সুস্থির, সুষমামণ্ডিত। গভীর মনোযোগে বিশ্বেশ্বরের হাতের লেখনী সচল। সুদৃশ্য টেবিল ল্যাম্পের মৃদু আলোতে তার মুখটা উজ্জ্বল। নিস্তব্ধ ভোর। পাখিদের কিচির মিচির এখনও শুরু হয়নি। নন্দিনী টেবিলের বিপরীত দিকে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে। ভ্রূক্ষেপ নেই ওর। নন্দিনী স্ত্রী, ধর্মপত্নী, কিন্তু মিত্র বা সখী হতে পারেনি। অথচ বয়সের ব্যবধান মাত্র ন'বছর। ওর ব্যক্তিত্বের কাছে সে যেন নিষ্প্রভা, ম্রিয়মান। আড়ষ্টতা ভেঙে সে কাছে এসে ঘেঁষাঘেঁষি হয়ে দাঁড়ায়। লেখনীর গতিরোধ হয়।

মুখ তুলে দেখেন বিশ্বেশ্বর। নন্দিনীর শির-চোখ-মুখ-বুক হয়ে ওর দৃষ্টি আবার দুচোখে স্থির। হঠাৎ দেখা অচেনা যুবকের চোরা দৃষ্টির মত চকিত নয়। অন্তর্ভেদী গভীর দৃষ্টি। স্বামী হলেও নন্দিনীর অস্বস্তি হতে থাকে । ক্রমশ ভাললাগার আবেশে রোমাঞ্চিত। হাসি ফোটে মুখে। অসময়ে সে হাসির তাৎপর্য অনুভব করে বিস্মিত বিশ্বেশ্বর। দুচোখে জিজ্ঞাসার অভিব্যক্তি। অবাক করে দিয়ে নন্দিনী শরীরটা ভেঙে ওর পায়ে হাত রাখে। ততোধিক অবাক হয়ে বিশ্বেশ্বর দ্রুত নন্দিনীকে বুকে টেনে নিয়ে আদরে আদরে পিষে জিজ্ঞাসা করেন, 'কী হল তোমার?' নাম ধরে ডাকেননা বিশ্বেশ্বর। মুখেও নেননা নামটা। তেইশ বছরের বিবাহিত জীবনে তেরোবারও নয়।

আদরের মায়াজাল থেকে নিজেকে সরিয়ে এনে নন্দিনী ওর দুই হাঁটুর সংযোগস্থলে মাথাটা রেখে ভারী কণ্ঠে হৃদয় অভ্যন্তরের ধিকি ধিকি জ্বালা নিয়ে অনুযোগ জানায়, 'তুমিতো সবসময় তোমার গল্পের নন্দিনীকে নিয়েই ব্যস্ত। রক্তমাংসের নন্দিনী মাথা কুটে মরে অনাদরে অবহেলায়।'

'আমিতো কিছুই বুঝতে পারছিনা। তবে তুমি চমৎকার বলেছো। সাহিত্যিকের মত সুন্দর বাক্য বিন্যাস।'

উপচে পড়ে নন্দিনীর খুশি। প্রশংসায় স্বামীর নাভিস্থলে মুখ লুকায়। বলতে ইচ্ছে করে, কার সান্নিধ্যে অতগুলো বছর অতিক্রান্ত, হতে তো বাধ্য! বলা আর হয়না। দ্বিধায় রেখে কষ্ট দিতে মন আনচান করে। শরীরটা তুলে কণ্ঠে বাহুর মালা পড়িয়ে বলে, 'আজ যে মশাই আমাদের বিবাহ বার্ষিকী।'

ত্রস্ত হয়ে ওঠেন বিশ্বেশ্বর। মুহূর্তেই তার মন স্থির। ড্রয়ার থেকে তুলে নেন একগুচ্ছ টাকা। নন্দিনীর হাতে দ্রুত গুঁজে দেন। নন্দিনীর খুশির গতি ক্রমশ মন্দীভূত। বিশ্বেশ্বরের দৃষ্টিতে তা এড়ায় না। কাঠগড়ায় দাঁড়ানো আসামীর মত কৈফিয়ৎ দেন, 'এ মুহূর্তে তোমাকে দেবার মত আমার কাছে আর কিছু নেই।'

'নেই আর কিছু?'

ধন্দে পড়েন বিশ্বেশ্বর। মস্তিষ্কে আলোড়িত নন্দিনীর জিজ্ঞাসা। ধীরে ধীরে হাসি ফোটে মুখে। পরম আদরে বুকে টেনে শাসন করেন, 'বুড়োর সঙ্গে অত রসিকতা কেন?'

'আমি ফুরিয়ে যাওয়া বুড়ি, সে কথাটাই ঘুরিয়ে বলছো! ধন্যি তোমরা সাহিত্যিকরা।'

'অত জটিলতার কথা বলোনা তো! ওদের সঙ্গে নিয়ে জমিয়ে বাজার করো আজ।'

দপ করে জ্বলে ওঠে নন্দিনী, 'তোমরা সাহিত্যিকরা সহজ ভাষায় জটিলতার কথা বলো। পাঠক-পাঠিকারা চিন্তায় আকুল। অনেক ভেবেও সমাধানের পথ খুঁজে পায়না। আর তোমরা সুস্থির মনে নাওয়া-খাওয়া করছো।'

হঠাৎ বিশ্বেশ্বরের মুখ গম্ভীর, কণ্ঠের স্বর ভারী, নন্দিনীর কাঁধে আলতো করে দুহাত রেখে

বলেন, 'আমাকে আর মায়াজালে আবদ্ধ করোনা। অনেক তো হল। আমি মুক্তির স্বাদ পেতে চাই।' নন্দিনীর আশঙ্কার সাথেই ওর চোখ থেকে দুফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ে। স্বামীর ভাবাবেগের পরিবর্তনে সম্বিত ফেরে ওর। আঁচল দিয়ে দুচোখ মুছে দেয়। হাঁটুর উপর মাথাটা রাখে। গভীর আবেগে দুহাতে ওর কোমর জড়িয়ে ধরে। বিবাহ বার্ষিকীর শুরুটা এভাবেই।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হতেই সদর দরজায় অসহিষ্ণুভাবে কড়া নাড়ার শব্দ। রশ্মি ছুটে গিয়ে দ্রুত খুলে দেয়। দুটো রিক্সায় নানাধরণের জিনিসপত্র দেখে রশ্মির দুচোখ বিস্ফারিত। মাকে ভেতরে ঠেলে দিয়ে ভাই-বোন মালপত্র নামিয়ে নিচ্ছে। উৎসাহের আতিশয্যে রশ্মিও হাত লাগায়। ঘরে ঢুকেই নন্দিনী শরীর এলিয়ে দেয় বিছানায়। আজ সে আনন্দে আত্মহারা। পুত্র-কন্যা নিয়ে বাজার করে খুশিতে উজ্জ্বল। কন্যা সাথী হলেও শ্রীমান একটু বড় হয়ে মায়ের লেজুড় হতে পা বাড়ায়নি। এক সাথে অত সামগ্রী দেখে পুত্রকন্যাও বিস্মিত। বিস্মিত নন্দিনীও কম হয়নি। একদিনে সাধারণ বাজার করাতে এত টাকা বিশ্বেশ্বর কখনও দেননি। পাঁ .. চ .. হা .. জা .. র!

রাত এগারটার মধ্যেই অন্ত-পর্ণা ঘুমিয়ে পড়ে। নয়টার আগেই রশ্মি। নিস্তব্ধ বাড়ি। আশপাশের বাড়ির দূরদর্শনে সঙ্গীত-সুর-সংলাপ। নন্দিনীর শুরু বিশেষ সাজ। স্বামীর পছন্দের। বিচিত্র পছন্দ ওর। কপট বিরক্তি প্রকাশ করে একদিন বলতেই নন্দিনীকে সংশোধিত করেন, 'কথাটা বিচিত্র নয়, বলো বৈচিত্র্য।' সাদা জমিনের লাল টকটকে জবা রঙের পাড়ের দামী গরদের শাড়ি খুঁজে হয়রান নন্দিনী। সেন্ট্রাল রোডের অপেক্ষাকৃত একটা ছোট্ট বস্ত্রালয়ে স্বামীর পছন্দের শাড়ি পেয়ে খুশিতে ডগমগ। টকটকে লালের সঙ্গে দুধের মত সাদা রঙের ব্লাউজ। পছন্দের সুবাস-চন্দন আর বেলফুলের ছড়ানো সুগন্ধ। পায়ের আল্‌তা লেপ্টে নয়, সূক্ষ্ম কাজের। কিন্তু মেহেন্দির ঘোরতর বিরোধী।

অপেক্ষায় অস্থির নন্দিনী। নিজের অজান্তেই এক সময় ঢলে পড়ে বিছানায়। গভীর রাতে দেয়াল ঘড়িতে একটানা দীর্ঘ মিউজিক। ধড়ফড়িয়ে ওঠে নন্দিনী। ক্ষুধা-ক্লিন্ন অবসন্ন শরীর। আবার শুরু হয় প্রতীক্ষা। দেয়াল ঘড়িতে দুচোখ আবদ্ধ। ভেতরে প্রশ্নের পর প্রশ্নের সমারোহ। অন্তহীন প্রশ্নের পর শুরু ভয়াবহতা। এত দেরী তো হবার নয়! শৃঙ্খলাপূর্ণ জীবন ওর। সামান্য দেরীর সম্ভাবনায় অগ্রিম তথ্য। কপাট খুলে দেখে দিনের আলোর মত স্বচ্ছতা। ভেতরের ভয়াবহতা সত্বেও পুত্র-কন্যার ঘুম ভাঙায়নি। একপাশে রাখা টেবিলের উপর মিক্‌সার মেশিন আর সরবতের সরঞ্জাম। বিশ্বেশ্বরের প্রিয় লস্যি তৈরির জন্যে প্রস্তুত। ভেতরটা তোলপাড়। কখনও ভয়ে, কখনও অভিমানে। অবরুদ্ধ কান্নায় জর্জরিত।

ভোরে ঘুম থেকে উঠে সব শুনে অন্ত-পর্ণা স্তম্ভিত। ছোট্ট রশ্মির ফ্যাল ফ্যাল দৃষ্টি। নন্দিনী এবার কান্নায় ভেঙে পড়ে। কান্নার জোয়ার পুত্র-কন্যার ভেতরেও সংক্রমিত। পর্ণা ছুটে মাকে প্রবোধ দিতে গিয়ে নিজেও কাঁদতে থাকে। রশ্মি নন্দিনীর পায়ে হাত বুলিয়ে দিচ্ছে।

অন্তু রাগে ফুঁসছে । হঠাৎ তার রাগের বহিঃপ্রকাশ ঘটে, ‘বাপির কাণ্ডজ্ঞান বলতে কিছু নেই। যত বুড়ো হচ্ছে, তত জ্বালাচ্ছে !’

পর্ণাকে ঠেলে সরিয়ে জ্যামুক্ত তীরের মত ছুটে গিয়ে নন্দিনী অন্তুর ডান গালে প্রচণ্ড এক চড় বসিয়ে দেয়। রাগে ফুঁসতে থাকে। একটু দম নিয়ে বলে, ‘বাবার সম্পর্কে অমন কথা বলতে তোর সাহস হল কী করে? ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করে লায়েক হয়েছিস, না? সারা জীবনেও বাবার নখের যোগ্য হতে পারবিনা।’

বিস্মিত পর্ণা, রশ্মিও। অন্তু স্তম্ভিত। ওদের মা সহজ সরল নারী। কখনও ওদের শরীরে হাত তোলেননি। নন্দিনী বিছানায় আবার আছড়ে পড়ে। কান্নার বেগ ত্বরান্বিত। মধ্যরাত থেকেই তার ভেতরটা তুষের আগুনের মত জ্বলছে। মনে মনে ক্ষমা করে দেয় স্বামীকে। সামান্য বিরক্তিতেই নিজের ছেলের ধৈর্যচ্যুতি, তিক্ত মন্তব্য। স্বামীর সমালোচনা যে তার কাছে অসহ্য! পর্ণা-রশ্মি ভয় পেয়ে দূরে সরে যায়। সাহস সঞ্চয় করে কাছে এসে মাকে প্রবোধ দিতে পারেনা। সবাইকে অবাক করে দিয়ে অন্তু মায়ের কাছে আসে। মায়ের মাথায় হাত রেখে জিজ্ঞাসা করে, ‘পুলিশে জানাতে হবেনা মামণি?’
আর্ত কণ্ঠের বলিষ্ঠ প্রত্যুত্তর, ‘না।’
‘না হলে সবাই একসঙ্গে ঘরে বসে কাঁদলে হবে? কিছু একটা করতে হবে। বাপিকে ফিরে পাব কী করে মামণি?’ বলেই অন্তু মায়ের শরীরে কান্নায় ভেঙে পড়ে।

অন্তুকে বুকে জড়িয়ে বাঁধভাঙা কান্না নন্দিনীর। বাড়ির সবার কান্না শুনে প্রতিবেশীরা আসতে শুরু করে। সে এক হৃদয়-বিদারক দৃশ্য। অগনিত মানুষের অসংখ্য প্রশ্ন, কৌতূহল, মন্তব্য। শ্রাবণ ধারার মত উপদেশ, পরামর্শ অঝোরে ঝরছে। জগতে হিতাকাঙ্ক্ষীর সংখ্যা বিরল হলেও উপদেশ দেবার মানুষের অভাব নেই। অনেকের সহজ মন্তব্যেও তির্যক ইঙ্গিত। ক্ষোভে-দুঃখে-শোকে নন্দিনী হঠাৎ জ্ঞান হারিয়ে ফেলে। সন্তানরা আঁৎকে ওঠে। মাকে নিয়ে কী করবে ভেবে পায়না। ভীড় সরিয়ে কাছে আসেন সাহিত্যিক সঞ্জীব চৌধুরী। বিশ্বেশ্বরের অনুজ সহকর্মী। ধমকে ওঠেন অন্তু-পর্ণাকে। মাকে ঘরে নিয়ে শুইয়ে দিতে আদেশ দেন। উপস্থিত প্রতিবেশীদের উদ্দেশ্যে হাত জোড় করে চ লে যেতে বলেন। নিজেই এক বালতি জল নিয়ে ঘরে ঢোকেন। নাকে-মুখে-চোখে সামান্য ছিটিয়ে পর্ণাকে মাথায় জল ঢালতে বলেন। দূরভাষে ডাঃ ভৌমিককে দ্রুত আসতে অনুরোধ করেন। ডাক্তার এসে চিকিৎসা করতেই সুস্থ বোধ করে নন্দিনী। পরক্ষণেই একটা ইঞ্জেকশন দিতে ঘুমিয়ে পড়ে।

সে ঘুম ভাঙে রাত আটটার পর। শিয়রে বসে দুই পুত্র-কন্যা। ওদের চোখে-মুখে গভীর উৎকণ্ঠা। একটা মোড়াতে বসে রশ্মিও নিশ্চুপ। সবাই নির্বাক। নিস্তব্ধতা সমস্ত বাড়িটায়। কক্ষে টিউব লাইটের সাদা আলো। দেয়াল ঘড়িতে ছন্দোবদ্ধ টিক্ টিক্ শব্দ। সেদিকে দৃষ্টি পড়তেই মস্তিষ্কের কাজ দ্রুততর। সব মনে হতেই দুশ্চিন্তার অন্ধকার মুখমণ্ডলকে গ্রাস করতে

থাকে। শোকে-অভিমানে বিশ্বেশ্বরের ওপর সব অভিযোগ ঘনীভূত হয়। শব্দহীন বিলাপের অনুরণন, হাতুড়ির আঘাতের মত, বুকের ভেতরটা চূর্ণ বিচূর্ণ। অতীত হাতড়াতে থাকে নন্দিনী।

বিয়ের কথা পাকা হতেই আমি ছিলাম ভয়ে জড়সড়। তোমার আমার পার্থক্য যে অনেক। তুমি উচ্চশিক্ষিত নামী সাহিত্যিক। তোমার প্রতিষ্ঠা, সম্মান অনেক উঁচুতে। আমার শিক্ষা অতি সাধারণ। তোমার সঙ্গে বেমানান। আমি সব জানি, বুঝি। অবুঝ ত নই। অবুঝের মত কোন কাজও করিনি। আমার দিকটা তুমি কখনও তেমনভাবে ভেবে দেখোনি। সামাজিকভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত পিতার একমাত্র কন্যা আমি। রূপসী না হলেও অনেক সুপ্রতিষ্ঠিত পাত্র বাবার মুখের দিকে চেয়ে অপেক্ষায় ছিল। উচ্চমাধ্যমিক শেষ হবার আগেই তোমাকে বেছে নিলেন বাবা। শিক্ষা অসমাপ্তির অতৃপ্তি নিয়েই তোমার সংসারে এলাম। তুমি বললে, 'বিদ্যালয়ের পুঁথিগত বিদ্যাই প্রকৃত শিক্ষা নয়।' আমার শিক্ষার সেখানেই সমাপ্তি। তুমি উচ্চশিক্ষিত জ্ঞানী মানুষ। তোমার কথার ওপর কখনও কথা বলিনি। কিন্তু পুঁথিগত শিক্ষা নিয়েই তো সবার জীবনে শিক্ষার ভিত গড়ে ওঠে। ভেতরের প্রশ্ন ভেতরেই গুমরে মরে।

উচ্চবিত্ত পরিবারের পরম আদরের একমাত্র কন্যা হবার সুবাদে সাংসারিক কাজে আমি ছিলাম একেবারেই অজ্ঞ। তোমার লেখালেখি আর চাক রির সুবিধার জন্যে তুমি শহরে চলে এলে। একটা সম্পূর্ণ নতুন সংসারের বোঝা আমার ওপর পড়ল। কাজের চাপে আমার প্রাণ ওষ্ঠাগত। ভুলো মন তোমার । সাংসারিক ব্যাপারে অজ্ঞ। আমিও মুখ ফুটে কখনও বলিনি কিছু। তোমার সান্নিধ্যসুখে আমার সব কষ্ট দূর হয়ে যেত। ক্রমশ কষ্টসহিষ্ণু হয়ে উঠি।

প্রশংসা, পুরস্কার ও অভিনন্দনে সাহিত্য জগতের প্রতিটা সিঁড়ি ভেঙে তোমার নিরবচ্ছিন্ন ঊর্ধ্বগতি। আমার স্বামীভাগ্যে আত্মীয় আর পরিচিত মহল ঈর্ষান্বিত। আমিও গরবিনী হয়ে একেক করে সংসারের যাবতীয় কাজ থেকে তোমাকে মুক্ত করে দিলাম। মুক্ত বিহঙ্গের মত তোমার নিজস্ব জগতে অবাধ বিচরণ শুরু। এ বাড়তি চাপের জন্যে ছিলনা কোন অনুযোগ কিংবা প্রতিদান-প্রত্যাশা। আর আজ? এ কি তোমার যথাযথ প্রতিদান? তোমার অনুপস্থিতিতে বাড়িটা খাঁ খাঁ শুষ্ক মরুভূমি। আমরা অভিভাবকহীন, যেন অনাথ। আমাদের শান্তির জ্যোতি অশান্তির অন্ধকারে ঢাকা। সবার উপরে প্রতিবেশীর কটাক্ষ, তির্যক মন্তব্য। আমার বুকের ভেতরে তুষের আগুনের ধিকি ধিকি জ্বালা। তুমি জ্ঞানী ও পুরুষ। আমি অজ্ঞ ও নারী। তোমার নিরুদ্দেশের রসালো আলোচনায় আমার উন্নত শির মাটির সাথে মিশে যেতে চাইছে। তোমার কাছ থেকে এমন কঠোর প্রতিদান কখনও আশা করিনি। কী নির্মম তুমি!

কেন তোমার এ নিরুদ্দেশ? গভীর চিন্তার অতলে তলিয়ে গিয়েও কোন তল খুঁজে পেলাম না। নিরুদ্দেশের জগতে কি শান্তি অপেক্ষা করছে? কী সেই শান্তি যার হাতছানি তুমি উপেক্ষা করতে পারনি? কিংবা আমাদের সাংসারিক বৃত্তে কী কষ্ট তোমার? ছিটকে বেরিয়ে গিয়ে

অশান্তির হাত থেকে বাঁচতে চাইছো? বার্ধক্যটা আমার সান্নিধ্যে থাকতে ভরসা পাচ্ছ না? কারও কাছে কি তোমার কোন দায়বদ্ধতা আছে? না হলে বারবার তোমার মুখে নিরুদ্দেশের কথা কেন? নাকি তুমি নিরুদ্দেশের রোগে ভুগছো? নিরুদ্দেশ কি একটি রোগ?

হঠাৎ ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে নন্দিনী। অতীত হাতড়াতে গিয়ে বর্তমানের কথা ভুলে যায়। পাশে বসে থাকা পুত্র-কন্যা মায়ের বুকে আছড়ে পড়ে ততোধিক জোরে কাঁদতে থাকে। সম্বিত ফেরে নন্দিনীর। ওদের মাথায় হাত বুলিয়ে রুদ্ধ কণ্ঠে বলে, 'কাঁদিস না বাবা।'

অন্তু কান্না মিশ্রিত কণ্ঠে বলে, 'বাপি না থাকাতে আমাদের খুব কষ্ট। কিন্তু মামণি, তোমার কিছু হলে আমরা বাঁচবনা। শিশুবেলা থেকে তুমি একাই আমাদের মানুষ করেছো। বাপি শুধু উপদেশ দিয়েই দায়িত্ব শেষ করতেন। আর ওঁর জগৎ নিয়েই মশগুল ছিলেন। আমাদের কথা চিন্তা করে তোমাকে সুস্থ থাকতে হবে।'

প্রাণপণে নিজেকে সংযত করে নন্দিনী। দুচোখ দিয়ে অঝোরে ঝরে অশ্রুধারা। পুত্র-কন্যারা বিছানা থেকে তুলে বসিয়ে দেয়। জোর করে এক গ্লাস দইয়ের সরবত খাইয়ে দেয়।

রাতের শেষ প্রহর। নন্দিনী নিদ্রাহীন। একটু তন্দ্রায় আচ্ছন্ন হতেই যেন দূরভাষের শব্দ। ধড়ফড়িয়ে ওঠে নন্দিনী। দূরভাষ তুলে কানে চেপে ধরে। অপর প্রান্তে বিশ্বেশ্বর কিংবা অন্য কারও কণ্ঠ শোনা যায়না। যেন শ্বাসরুদ্ধ কেউ নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে। এতক্ষণ তাহলে কি স্বপ্ন দেখছিল সে? অনেক চেষ্টা করেও স্বপ্নের কোন দৃশ্যের কথা স্মরণ করতে পারেনা। স্বামীর কণ্ঠে দূরভাষের মাধ্যমে নিজের নামটা শুনবে বলে ভেতরটা কিঞ্চিত রোমাঞ্চিত। পরক্ষণেই সে তার নিজের অদৃষ্টের কথা ভেবে হাসতে থাকে। সে কী হাসি! বিভীষিকাময় হাসি। একটানা অনেকক্ষণ ধরে।

দরজায় ধুমধাম শব্দ। অনেকক্ষণ পর হাসির মধ্যেই নন্দিনী দরজা খুলে দেয়। পুত্র-কন্যার চোখ বিস্ফারিত। ভয়ে ওদের শরীর অসাড়। মামণি এভাবে হাসছে কেন? পাগল হয়ে গিয়েছে নাকি! পড়ে যেতেই ধরে ফেলে ওরা। ভয়ে কেঁদে ওঠে পুত্র-কন্যা। শেষ রাতে কী করবে ভেবে পায়না। চোখে-মুখে জল ছিটোতে থাকে। ভোরের দিকে জ্ঞান ফেরে নন্দিনীর।

পুরোটা দিন মাকে চোখে চোখে রাখে পুত্র-কন্যা। জোর করে এটা-ওটা খাইয়ে দেয়। সন্ধ্যার পর অন্ধকার হতেই গতরাতের দূরভাষের কথা মনে পড়ে নন্দিনীর। হাত বাড়িয়ে বিশ্বেশ্বরের ব্যবহৃত নিজস্ব ড্রয়ারটা টেনে ডায়েরীর পাতা উল্টাতে থাকে। কয়েকটা পাতা ছিঁড়ে ব্লাউজের ভেতর চালান করে দেয় সবার অজান্তে। মোমটা নিভিয়ে শুয়ে পড়ে বিছানায়। ভবিষ্যত পরিকল্পনা করে মনে মনে। লোডশেডিং অন্তে আলোর জন্যে অধীর অপেক্ষায় থাকে।

দীর্ঘ লোডশেডিংয়ের পর আলো জ্বলে। অপেক্ষায় অস্থির নন্দিনী উঠে পরে। স্নান ঘরে গিয়ে নন্দিনী সংগোপনে ডায়েরীর পাতাগুলি পড়ে। স্নানঘর থেকে বেরিয়েই নন্দিনী অন্য মানুষ।

থানাতে এফ. আই. আর. করতে অন্তুকে নির্দেশ দেয়। থানার কথা শুনে ঘাবড়ে যায় অন্তু। দূরভাষে সঞ্জীবকাকুকে ডাকে। থানা থেকে ফিরতে রাত দশটা। নানা ধরণের প্রশ্নের সম্মুখীন হয়ে অন্তু বিপর্যস্ত। ঘন্টার কাঁটা ঠিক এগারটায়। বিশাল সুদৃশ্য দেয়াল ঘড়ির এগারটা শব্দ শেষ হয়ে মিউজিক শুরু হতেই সদর দরজায় অসহিষ্ণু ধাক্কা। মানুষের উচ্চ কোলাহল। কেউই ঘুমোয়নি তখনও। অন্তু গিয়ে সদর দরজা খুলে দিতেই পশ্চিম থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী। নন্দিনীকে নিয়ে যেতে এসেছে ওরা। এক মৃত ব্যক্তিকে সনাক্ত করতে হবে। মাষ্টার পাড়ার পথটা যেখানে শেষ, সেখানে একটা বাঁধ। বাঁধের বিপরীত পাড়ে ঝুলন্ত সেতুর পাশে একটা মৃতদেহ। ছুরিকাঘাতে বিকৃত মুখমণ্ডল। চেহারা দেখে পরিচয় পাবার কোন উপায় নেই। অন্তু-পর্ণা দুজনেই মায়ের সঙ্গে যায়।

হাসপাতালে গিয়ে কান্নায় ভেঙে পড়ে নন্দিনী। নিশ্চিতভাবে সনাক্ত করে বিশ্বেশ্বরের শব। পুত্র-কন্যা দুজনেই ধন্দে পড়ে। ওরা নিশ্চিত এ তাদের বাপি নয়। ওদের মামণি মুহূর্তেই নিশ্চিতভাবে সনাক্ত করায় এরা বিস্মিত। ময়না তদন্তের পর শেষরাতে পুলিশ বিশ্বেশ্বরের মৃতদেহ বাড়িতে পৌঁছে দেয়। লোকে লোকারণ্য। তিলধারণের জায়গা নেই মাষ্টার পাড়ার রাজপথে। চতুর্থদিনেই পারলৌকিক ক্রিয়াকর্মের সমাপ্তি। অপঘাতে মৃত্যুর অশৌচ সংক্ষিপ্ত।

ক্রিয়াকর্ম শেষ হতে আবার অন্য ব্যস্ততা। নন্দিনী সরকারি কাজ গ্রহণ করতে সম্মত নয়। অন্তুর চাকরির জন্যে আবেদন করে। সঞ্জীববাবু অনেক বুঝিয়েও ব্যর্থ হন। হাল ছেড়ে দিয়ে অন্তুর জন্যে উদ্যোগ নেন। পনের দিনের মাথায় অন্তু জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে কাজে যোগ দিতে নন্দিনী সুস্থির হয়ে ওঠে। সে সুস্থিরতা অর্থনৈতিক, শরীর কিংবা মনের নয়। সঞ্জীববাবুর অক্লান্ত পরিশ্রম আর বিশ্বেশ্বরের সুনাম-সুখ্যাতিতে কাজটা ত্বরান্বিত হয়েছে।

পিতার মৃতদেহ সনাক্ত করবার পর থেকেই মায়ের প্রতি ওদের সন্দেহ। দিন গড়িয়ে যায়, সন্দেহ বাড়তে থাকে। অন্তু-পর্ণার ফিসফিস আলোচনা। স্টিলফ্রেমে বাবার যে ছবি টেবিলের উপর রাখা, তাতে হাত দেবার সুযোগ কারও নেই। কোথাও বেরুবার সময় নন্দিনী ভেতরে ঢুকিয়ে তালা লাগিয়ে দেয়। ছবিটা ফ্রেম থেকে খোলা মায়ের নিত্যদিনের অভ্যেস। বাপির ছবির পেছনে কিছু একটা রয়েছে, এ সম্পর্কে ওরা নিশ্চিত। এই গোপনীয় ব্যাপারটা নিয়ে ওদের মন তোলপাড়। মায়ের প্রতি শ্রদ্ধা কমতে থাকে। ঘৃণা জন্ম নেয়।

পাতলা ছিপছিপে শরীর নন্দিনীর। বয়সটা এখনও ওকে কাবু করতে পারেনি। এখন সে হাল্কা রঙের তাঁতের শাড়ি পরে। চেহারা, ব্যক্তিত্ব, মার্জিত পোষাক আর সুন্দর মুখশ্রীতে এখনও অনবদ্য, অসামান্য সুন্দরী। সন্দেহের আগুনে এটা যেন ঘৃতাহুতি।

নন্দিনী নির্বিকার, প্রায় নির্বাক। সবার জিজ্ঞাসার উত্তর দেয়, নিজে কোন প্রশ্ন করেনা।

পুত্র-কন্যার মনের অবস্থা ওর অজানা নয়। দীর্ঘ নিঃশ্বাস অন্তস্থ করে। ওদের অবজ্ঞা-উপেক্ষায় অন্তরাত্মা কেঁপে ওঠে। আড়ালে অশ্রু ঝরে। আত্মজন কিভাবে পর হয়ে ওঠে তা প্রত্যক্ষভাবে উপলব্ধি করে। মানুষের সম্পর্কে কত জটিলতা। কবিতায় স্বামীর বিশ্লেষণের কথা মনে পড়ে। ওদের সন্দেহের কারণ যে অমূলক এ কথা নন্দিনীর চাইতে কে আর বেশি জানে! ওদের ব্যবহারে বিস্মিত হলেও মনক্ষুণ্ণ নয়। ওদের কাছে সব অকপটে প্রকাশ করা অসম্ভব। ওদের স্বচ্ছ মন কালিমায় কলঙ্কিত হবে। শ্রদ্ধার আসন হবে ঘৃণিত। কাজটা যে কত বড় লজ্জার আর স্বার্থপরতার ভাবলেই শিউরে ওঠে নন্দিনী। জীবনে বিশ্বেশ্বর কখনও এমন কাজ করবে, স্বপ্নেও ভাবেনি সে।

সঞ্জীব এলেই নন্দিনী মুখ খুলতে বাধ্য হয়। ভেতরে দুঃখের এতগুলি স্তর নিয়েও সহজ হবার আপ্রাণ চেষ্টা করে। আড়ালে দাঁড়িয়ে পুত্র-কন্যার সজাগ দৃষ্টি। কোন অসঙ্গতি চোখে পড়েনা। তবুও সন্দেহের কীট ওদের মনে কিলবিল করে। এ সন্দিগ্ধ সম্পর্ক নিয়েই একুশটি দিন অতিক্রান্ত।

রশ্মির দেয়া চা ততক্ষণে জল। টের পেলে আবার দিয়ে যেত রশ্মি। নিজে থেকে বলার তাগিদ অনুভব করেনা নন্দিনী। গত রাতে অত নিদ্রার পরও শরীরটা ঝরঝরে নয়। দুর্বল, অবসন্ন। শরীরের ওপর কোন আধিপত্য নেই। টেবিলের ওপর থেকে স্টিল ফ্রেমের ছবিটা বুকে টেনে নিতেই ঢলে পড়ে বিছানায়। ছবিটা মেঝেতে আছড়ে পড়ে কাচের টুকরো বিক্ষিপ্তভাবে ছিটকায়।

অন্তু, পর্ণা, রশ্মি যে যার কাজ ফেলে ছুটে আসে দ্রুত। যন্ত্রণায় কাতরায় নন্দিনী। শরীরের স্পর্শে চমকে ওঠে ওরা। উত্তাপে শরীরটা পুড়ে যাচ্ছে। কী করবে ভেবে পায়না। রশ্মি মনে করিয়ে দেয়, 'মামু, সঞ্জীবদাদুকে টেলিফোন করে দাও। ওই দাদু এলে সব ব্যবস্থা হবে।'
দাঁতে দাঁত চেপে অন্তুর গম্ভীর উত্তর, 'না, তুই চুপ কর!'

মেঝেতে পড়ে থাকা বাপির ছবিটায় হঠাৎ চোখ পড়ে অন্তুর। কাচের টুকরো পরিষ্কার করতে রশ্মিকে নির্দেশ দেয়। নিজে ছবিটা তুলে নেয়। তুলে নিতেই দেখে ছবির নিচে কয়েকটা ভাঁজ করা ছেঁড়া কাগজ। তড়িৎগতিতে তুলে নিয়ে অন্তু ভাঁজ খোলে। রহস্যের গন্ধ পায় ভাই-বোন। ভুলে যায় মায়ের অসুস্থতার কথা।

গভীর মনোযোগে পড়ছে অন্তু। পর্ণার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দাদার চোখে। রশ্মি চঞ্চল মনে কাচের টুকরো তুলছে। তার চোখের দৃষ্টি অস্থির। কখনও ওদের দিকে, আবার কখনও মুমূর্ষু নন্দিনীর দিকে। অন্তুর শরীর থরথর করে কাঁপছে। পড়া শেষ হতেই সে মেঝেতে বসে পড়ে। ক্ষোভে-দুঃখে নিজের চুল টেনে ছিঁড়তে ইচ্ছে করছে তার। পর্ণা কিছুই বুঝতে না পেরে দাদার হাত থেকে কাগজের টুকরোগুলো কেড়ে নেয়। গভীর মনোযোগে বিস্ফারিত দৃষ্টিতে দেখে

এ যে বাপির ডায়েরির ছেঁড়া পাতা। পরিপাটি করে দ্রুত পড়তে থাকে —

প্রিয়তমা নন্দিনী আমার,

মহাসমুদ্রের বিশাল তরঙ্গের মত তোমার ভেতরটা প্রশ্নের পর প্রশ্নে উত্তাল, তোমার সরল জীবন ধারায় অশান্তির ঝড়, আশ্চর্য সুন্দর দুচোখে অশ্রুধারা - এ আমি নিরুদ্দেশে যাবার আগেই স্পষ্ট অনুভব করছি। তোমার এ পরিণতির জন্যে কে দায়ী জান? তোমার পরম প্রিয় স্বামী, নরাধম, অক্ষম আমি। চিরজীবন যাকে তুমি দিয়েই এসেছো, পাওনি প্রায় কিছুই। তোমার ত্যাগ, কষ্ট-সহিষ্ণুতা ও সীমাবদ্ধ প্রত্যাশায় নির্ভর করে সামাজিক মর্যাদার উঁচু স্তরে সাবলীল গতিতে উঠতে পেরেছে যে, সে-ই তোমাকে নিক্ষেপ করেছে অশান্তির আগ্নেয়গিরিতে। এ যে কত বড় অমানবিকতা, কৃতঘ্নতা ও নিষ্ঠুরতা তা বলার অপেক্ষা রাখেনা। এ অমানবিকতাই চলে আসছে মানব সৃষ্টির শুরু থেকে। প্রতিটি সৃষ্টির অন্তরালেই থাকে অন্য অনেকের ত্যাগ, তিতিক্ষা ও আত্মাহুতি, যা কেউ জানতে পারেনা। জানবার চেষ্টাও করেনা। কর্তা ব্যক্তিকে নিয়েই সবাই মশগুল।'

ডায়েরির ছেঁড়া পাতার প্রথম টুকরো এখানেই শেষ। পর্ণা এবার দ্বিতীয় টুকরোটি নিয়ে পড়তে থাকে।

'আজ এক বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়েই আমার এ লেখা। পারিবারিক মর্যাদা ও আর্থিক সুস্থিরতার জন্যে তোমাকে কয়েকটি কাজ করতে হবে। এ তোমার স্বামীর নির্দেশ কিংবা পরামর্শ নয়। এক মহিয়সী নারীর কাছে এক অক্ষম স্বামী ও পিতার সবিনয় নিবেদন।'

দ্বিতীয় টুকরোটির নিচের অংশ ছেঁড়া। হাত দিয়ে তড়িঘড়ি করে ছেঁড়া হয়েছে। তৃতীয় টুকরোটি ছেঁড়া নয়। দুমড়ানো মুচড়ানো। পর্ণা আবার পরিপাটি করে পড়তে থাকে।

'তোমার মত অমায়িক ও সরল মনের নারীর ক্ষেত্রে এ যে কত নির্মম ও নিষ্ঠুরতার কাজ সে আমার অজানা নয় নন্দিনী! অনেক বিচার বিশ্লেষণ করে আর নিরুপায় হয়েই আমার এ বিনীত অনুরোধ।

'একটা প্রশ্ন আমার মনে বিক্ষিপ্তভাবে আঘাত করছে, সন্তানরা তোমার কাজে বিস্মিত হবে। কিন্তু সন্দেহের আগুনে দগ্ধ হয়ে তোমাকে অবজ্ঞা কিংবা উপেক্ষা করবে না তো? তোমার আমার সম্মিলিত রক্ত যাদের শরীরে প্রবাহিত, ওরা এমনটা করবেনা বলেই আমার বিশ্বাস।

'আর একটা প্রশ্ন অহরহ আমাকে আঘাত করছে। সঠিক সমাধানে যেতে পারছি না। কে না জানে সংসারে মায়ের স্থান সবার আগে, সবার উপরে। কিছু সংখ্যক স্ত্রীর ভূমিকা মাকেও ছাড়িয়ে যায়। কিন্তু আমার জীবনে? আমার পরম স্নেহশীলা জননী না প্রিয়তমা স্ত্রী? যে স্ত্রীর ভূমিকা প্রিয়তমার মত মধুর, সখীর মত সহচরী, শিষ্যার মত ভক্তিমতী এবং মায়ের মত স্নেহশীলা!'

শেষ টুকরোটি ছোট্ট। দাঁতে দাঁত চেপে পর্ণা পড়তে থাকে। দুচোখে অশ্রুধারা ঝরছে।

'পরজন্ম আর আত্মায় আমার বিশ্বাস সুদৃঢ় নয়। তোমার বিশ্বাস থেকে কিঞ্চিত ধার নিয়ে বলছি, পরজন্মে যেন আমি তোমার স্ত্রী হয়ে এ অপরিশোধ্য ঋণের ভার কিছুটা পরিশোধ করতে উদ্যোগী হতে পারি। কখনও যদি তোমার অনুভবে আসে যে আমার এ আত্মা পার্থিব শরীরটা ছেড়ে চলে গিয়েছে, ফুলে ফুলে ঢেকে দিও আমার রচিত সব গ্রন্থ। এটাই হবে আমার পরম প্রাপ্তি।'

তৃষ্ণায় একদিন

কমল হঠাৎ ইলেকট্রিক শক্ খাওয়ার মত চমকে ওঠে। ব্লক ভর্তি মানুষের সামনে সমরেশের স্ত্রী পায়ে হাত দেবে, কমল ভাবতেও পারেনি। মার্চ মাসের শেষ সপ্তাহে দক্ষিণ জেলার ব্লকগুলোতে কাজের চাপ একটু বেশিই থাকে। ওরা কয়েক মিনিট বসে কমলের ব্যস্ততা দেখে চলে গেল। অর্থাৎ চলে যেতে বাধ্য হল। কমলের ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ে। অন্তরা তাকে চিনতে পারেনি, নচেৎ কেলেঙ্কারী হয়ে যেত।

অন্তরার কথা পরে হবে। আগে সমরেশের কথা বলা যাক। বি এস সি সেকেণ্ড ইয়ারে ওঠার সাথে সাথেই মেডিক্যালে চান্স পায়। হস্টেলে থাকতেই সে কমলদা বলতে অজ্ঞান। সরল মনের ছেলে। উড়িষ্যায় পড়তে যাবার আগের দিন রাতে বাড়ি থেকে এসে কমলের গেষ্ট হয়েছিল। তার বন্ধুরা সব হেসেছিল। কমল প্র্যাকটিক্যাল ক্লাশ মিস্ করে এয়ারপোর্ট পর্যন্ত যায় তার সঙ্গে। সিকিউরিটি রুমে ঢুকতেই হঠাৎ কমলের পায়ে সমরেশের হাত আর চোখে জল। সেই ছেলে এখন জুনিয়র ডক্টর এসোসিয়েশনের নেতা। সমিতির কাজেই বিলোনীয়া এসেছে।

বি এস সি পাশ করে কমল রামকৃষ্ণ সারদেশ্বরী মঠে পেয়িং গেষ্ট। টিউশনিই তার পেশা। কমলের সঙ্গে স্বপন, ভজন, চন্দন ছাড়াও অনেকেই থাকত। স্বপন ও চন্দন কলেজের ছাত্র। এরা পড়াশোনায় ভাল। প্রায়ই বইয়ের জন্যে বীরচন্দ্র লাইব্রেরীতে যেত। ওদের ষাট টাকার কার্ড। কমলের একশ টাকার। ওরা পাঠ্য বিষয়ের রেফারেন্স বই আনত। কমল আনত হস্তরেখার বই। কিন্তু তার একশ টাকার কার্ডে কাজ হতনা। কিরো, রেনি, বেনহামের বইয়ের দাম অনেক বেশী। স্বপন ভদ্র একদিন বলল, 'কমলদা, আমাকে আপনার বইয়ের দায়িত্ব দিন, বিনিময়ে আমার হাতটা ভালভাবে দেখে দিতে হবে।' কমল আশ্চর্য হয়ে বলে, 'তোমার সোর্সটা কী শুনি?' ভদ্র রহস্যময় হাসিতে জবাব দেয়, 'আমাদের এক দিদি আছে লাইব্রেরীতে, অন্তরাদি।' একদিন বিকেল বেলায় ভদ্র কমলকে নিয়ে আসে লাইব্রেরীতে। তার দিদিকে কমলের কথা এক লাইন বলেই দ্রুতগতিতে খেলার মাঠে চলে যায়।

সম্পর্ক আপনগতিতে চলতে থাকে। কাজের ফাঁকে ফাঁকে অন্তরা দাশগুপ্তা কমলকে বিভিন্ন প্রশ্ন করে, 'তোমার নাম কী ? তুমিও কি ভদ্রদের সাথে আশ্রমে থাক?' ইত্যাদি জেনে নেয়। অন্তরা দাশগুপ্তা কমলেরও অন্তরাদি হয়ে যায়। যদিও অন্তরা তার বছর চারেকের ছোট হবে। জীবনের পরবর্তী সময়ে কমল দেখেছে, মেয়েরা নিজের থেকে বেশি বয়সের ছেলেদের সম্পর্কের জোরে নাম ধরে ডাকতে ওস্তাদ। কার্ডের চাইতে বেশি দামের বই দেবার ক্ষমতা

অন্তরাদির ছিলনা। তবে রিডিং রুমে পড়ার জন্যে দামী দুষ্প্রাপ্য বই যোগাড় করে দিত।

অন্তরাদির ভক্তের অভাব ছিলনা। তার মত শ্যামাঙ্গী মেয়ের এত রূপ খুব কম মেয়ের দেখা যায়। তার সদা স্মার্টনেস ভঙ্গি আর সুন্দর হাসিমুখ যেকোন পুরুষের হৃদয়কে ম্যাসাকার করে দেবার ক্ষমতা রাখে। বই আদান-প্রদানের সময় কমলের সঙ্গে দু-একটি কথা হত। রিডিংরুমে অনেকবার ঘুরে যেত। কমল ভয়ে কথা বলতনা নিজে থেকে। আশ্রমের অনুষ্ঠানে হঠাৎ দেখা হলে সে ভদ্রকে ডেকে দিত। ভদ্র আর অন্তরাদি যেন আপন ভাই-বোন। ভদ্র প্রায়ই বলত অন্তরাদির মত মেয়ে হয়না। সেতো কমল নিজেই জানে। অন্তরাদি কমলদার কথা প্রায়ই জিজ্ঞাসা করে। কমল ভাবতো এটা ভদ্রের বানানো কথা। কমলের সদা ব্যস্ততার জন্যে সে অন্তরাদির কথা ভুলে যায়।

আজ প্রায় বার বছর পর কমলের জীবনে অনেক পরিবর্তন এসেছে । আর্থিক, পারিবারিক ও সামাজিক সব ক্ষেত্রেই এখন অনেক সুস্থির। কমলের জীবন ব্যস্ততাময় হলেও মনটা সব সময় শান্ত । তার জীবনে কোন জটিলতা নেই। অন্তরা দাশগুপ্তা স্নেহভাজন ছোটভাই সমরেশের স্ত্রী হয়েছে, এটা কমলের কাছে অত্যন্ত খুশির খবর। অন্তরার রূপ ও গুণের তুলনা হয়না। তার পছন্দের সত্যি প্রশংসা করতে হয়। তবে পছন্দের লোকটিও চমৎকার। সুন্দর-সুপুরুষ-স্মার্ট-প্রতিষ্ঠিত। 'ঘরনী ঘর পায়না আর সুন্দরী বর পায়না' প্রবাদটি ওরা মিথ্যে প্রমাণিত করেছে।

সমরেশের ওপব কমলের রাগ হয়। কী দরকার ছিল কবে কোথাকার হস্টেলের এক বছরের সিনিয়ার দাদার সঙ্গে দেখা করার? তাও যদি বিখ্যাত কেউ হত। আগের কথা ভুলতে পারছ না, সে না-হয় মানা গেল । তাহলে তুমি একা এসে দেখা করে যাও। আজ যদি অন্তরা চিনতে পারত কমলকে? ওফ্, ভাবতে পারেনা সে। দিদি ছোটভাইকে প্রণাম করেছে। তুমিই বা কেমনতর মেয়ে? পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম আছে নাকি আজকাল? তাও অফিসে একগাদা লোকের সামনে? শান্ত সুশীলা হতে চাইছো? তোমাকে চিনিনা আমি? তুমি ভুলে যেতে পার । আমি ভুলিনি।

সারাদিনের মানসিক চাপের পর কমল সন্ধ্যায় বিছানায় গা এলিয়ে দেবে ভেবেছিল। মাসি এসে বলে, 'বাবু, একজন লোক দেখা করতে এসেছে।' মনটা বিরক্তিতে ভরে যায়। ব্লকের ব্যাপার বাড়িতে এসে আলোচনা করলে ভাল লাগেনা কমলের। উঠান থেকেই শব্দ আসে, 'কমলদা, আমি সমরেশ।' চমকে বাইরে এসে সমরেশের শরীরকে অতিক্রম করে কমলের চোখ দূরে লক্ষ্য করতেই সমরেশ বলে, 'না দাদা, অন্তু আসেনি।'

অন্তু! অন্তরা! অন্তরা দাশগুপ্তা! কমলের শান্তি বিনাশকারিণী! সমরেশ ঢোকে। বিছানায় গড়াগড়ি দিয়ে বলে, 'আমি কী খাব?' কমল মাসিকে ডাকতেই সমরেশ তড়াক করে লাফ দিয়ে উঠে বলে, 'বাইরে যেতে দেবনা। ঘরে যা আছে তাই খাব।'

'নারকেলের সন্দেশ খেতে পার।'

'মিষ্টির অল্টারনেটিভ কিছু নেই?'

'বাদাম আছে।'

'বাদাম কী দিয়ে খাব?'

'তাইতো! আচ্ছা মাসি, দুপিস্ মাছ পোস্ত দিয়ে ভেজে বাদামের সঙ্গে দাও।'

'বাবু একটু এদিকে ....'

'মাসি! নো কানাকানি, নো চুপিচুপি। অন্তুর জন্যে প্রাণভরে কিছু খেতে পারিনা।'

কমল হেসে ওঠে। মাসিও। হাসিমুখেই কমল বলল, 'তুমি তাই দাও। আমাকে শুধু সন্দেশ দাও।'

মাসি অবাক হয়ে যায়। পোস্ত দিয়ে মাছ ভাজার সঙ্গে বাদাম! এই বাবুর লাজ-লজ্জা কম। ঢুকেই কী খাব? পেটুক কোথাকার! ভাতও খাবে নিশ্চয়ই। আমি মাছ মিলিয়ে অতিথিকে খাওয়াবো কেমন করে? আবার ডিমের জন্যে ছুটতে হবে। সাহেব ঘরে ঢুকেই জগন্নাথ। আর বেরুবেনা কোথাও। তবে লোকটাকে দেখে ভালই লাগছে। একটু খাই খাই ভাব, এই যা। অন্তু মানে বউ-ই হবে। আবার বউয়ের বদনাম অন্যের কাছে। মাছ ভাজার সঙ্গে বাদাম কোন্ বউ খেতে দেবে? অসুখ করলে সেই বউকেই ঠেলাটা সামলাতে হবে।

কমল ভাবছে সমরেশের শরীরটা এখনও সুন্দর রয়েছে। বাড়তি চর্বি নেই। এ প্রশংসা অন্তরার প্রাপ্য। ওরা যেন দুনম্বর হস্টেলের সাতাশ নম্বর রুমে রয়েছে। সমরেশ সহজ, সরল ও আন্তরিক। মেলামেশা এখনও অম্লান। সমরেশের কথায় কমলের খাওয়া বন্ধ হয়ে যায়। ভাবনার মাঝে একটা তীব্র চাবুকের আঘাত।

'কমলদা, অন্তু তৃষ্ণা অভয়ারণ্যটা একটু দেখতে চায়।'

'বেশতো, ঘুরে এসো।'

'আপনাকে কাল দুটোর পরে অন্তুকে নিয়ে যেতে হবে।'

'আমি! না না না, আমাকে দুটোর পরে বাড়ি যেতেই হবে। প্রতি শনিবার দুটোর পরে বাড়ি যাওয়া আর সোমবার সকালে ফিরে আসা অপরিবর্তনীয় ঘটনা। তাছাড়া বাড়িতে পুরুষ বলতে কেউ নেই। তুমি নিজে গিয়ে দুজনে মিলে ঘুরে এস।'

'আমার কনফারেন্স রাত নটা অব্দি চলবে। আমি বৌদিকে বাড়িতে এক্ষুণি জানিয়ে দিচ্ছি। আপনি টেলিফোন নম্বরটা দিন।'

'সমরেশ তুমি বুঝবেনা, না গেলে আমার অন্য একটা ব্যাপারে ভীষণ ক্ষতি হয়ে যাবে।'

'ফ্র্যাঙ্কলি বলুনতো দাদা, ভীষণ ক্ষতিটা কী?'

'তোমাকে সেটা বলা যাবেনা।'

'অতএব আপনাকে যেতে হবেই। আমি ভীষণ বিপদে পড়েছি দাদা।'

'সমরেশ, আমি মানসিকভাবে প্রস্তুত নই।'

'আচ্ছা ঠিক আছে দাদা, আপনি গাড়ি ড্রাইভ করতে পারেন তো?'

'না, পারিনা।'

'আপনারা পাঁচটার মধ্যে ঘুরে চলে আসুন। তারপর অন্তুকে নামিয়ে দিয়ে আপনি উদয়পুর চলে যান। ড্রাইভার পরদিন সকালে গাড়ি নিয়ে ফিরে আসবে। রাতে টেলিফোনে কথা হবে।'

কমল ভেবেছিল অন্তরা দুটোর সময় ব্লকে গিয়ে হাজির হবে। ফিরে এসে খাওয়া দাওয়া করে অপেক্ষা করছে। তবে কি অন্তরা প্ল্যান বাতিল করে দিয়েছে? এ অনিশ্চয়তা তার ভাল লাগেনা। আরও আধ ঘন্টা অপেক্ষা করে সে বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা হবে। ঠিক তিনটের সময় অন্তরা হাজির। একজন গিয়ে খবর দেয়। কমল গিয়ে দেখে, স্টিয়ারিং ধরে বসে আছে অন্তরা। আর কেউ নেই। চারদিকে উৎসুক জনতার বিস্ফারিত চোখ, মেয়ে গাড়ি চালাচ্ছে! কমল অন্যদিকে দৃষ্টি দেওয়া অন্তরাকে উদ্দেশ্য করে বলে, 'ড্রাইভার কোথায়? খুব নরম স্বরে উত্তর এল, 'দাদা, আমার নাম অন্তরা। ড্রাইভার হোটেলে খাচ্ছে। আপনি উঠুন। আমি নিয়ে যেতে পারব।' অবাক হয়ে কমল দ্রুত বলে, 'একটু অপেক্ষা করা যাক। ড্রাইভার না এলে আমার একজন পরিচিত ড্রাইভার সিন্ডিকেট থেকে নেওয়া যাবে।' তাদের আর অপেক্ষা করতে হলনা। ড্রাইভার হন্তদন্ত হয়ে এসে সাইকেলটা রেখে গাড়ির কাছে এল।

হাল্কা ধূসর রঙের মারুতি দ্রুতগতিতে চলছে। ওরা পাশাপাশি বসে। কোন কথা নেই। মনোযোগ দিয়ে আজকের দৈনিকটা পড়ছে অন্তরা। কমল উস্‌খুস্‌ করলেও খুব খুশি হয়েছে। অন্তরা তাকে একদম চিনতে পারেনি। আর ভয় নেই, সংকোচও নেই। নিরুদ্বেগ মেলামেশা। অন্তরার সুরেলা কথায় মুহূর্তে নীরবতা ভেঙে যায়, 'পড়বেন এটা?'

'না না, আমি একটু আগে দেখেছি।' কমল দেরি না করে বলে। অন্তরা কমলের দিকে রহস্যময় দৃষ্টির প্রলেপ বুলিয়ে দিয়ে বলল, 'তাহলে এ কাগজটা একটু দেখুন।' বাড়িয়ে দেওয়া পাঁচটি আঙুলের ভেতর থেকে কাগজটা নিয়ে চোখ পড়তেই কমলের সমস্ত শরীর যেন হিম হয়ে যায়। পিঠটা প্রাণপণে উঠিয়ে কিছু বলতে যেতেই বাধা পড়ল, 'আগে সবটা পড়ুন না, প্লিজ!'

অন্তরার কথা শুনে বাধ্য ছেলের মত কমল বিস্ফারিত চোখের সামনে কাগজটা মেলে ধরে।

'আমি জানি তুমি আমাকে অবজ্ঞা করো, অবহেলা করো। কিন্তু তোমার কাছ থেকে ছলনা আমি আশা করিনি। তুমি এই ক'বছরের ব্যবধানে অন্তরাকে চিনতে পারনি, এটা কী করে বিশ্বাস করি বলো? তোমার স্মৃতি এতটা দুর্বল হতেই পারেনা। তুমি আমার অবস্থাটা জাননা, কখনও জানতে চাওনি। আমি তোমাকে মিনতি করছি। এখন থেকে কয়েক ঘন্টা আমি যা

করব, তুমি তার প্রতিবাদ করোনা। ড্রাইভারের সামনে আমাকে ছোট করোনা। তুমি শুধু নীরব থেকো। কয়েক বছরের দীর্ঘ অপেক্ষার পর এ সময়টুকু আমি অর্জন করেছি। তুমি সময়টা নষ্ট করলে আমি সইতে পারবনা। তুমিও দায়ী থাকবে তোমার অন্তরের অন্তরার কাছে চিরদিন।'

কমল ঘাড় ঘুরিয়ে নিতেই অন্তরা বেদনা ভরা চোখে চোখ রাখে। নিষ্পলক দৃষ্টি। গাড়ি দ্রুতবেগে চলছে। বড়পাথারী হয়ে জয়চাঁদপুর আসতেই অন্তরা ড্রাইভারকে গাড়ি থামাতে বলে। নীরব থাকার প্রতিজ্ঞা ভেঙে হঠাৎ কমল বলে ফেলে, 'না, রাজনগর নিয়ে চলো।'

অন্তরা দাঁতে দাঁত চেপে সহ্য করে নেয়। ড্রাইভার জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকাতে অন্তরা প্রতিবাদ করেনা। রাজনগর গাড়ি পৌঁছলে অন্তরা ড্রাইভারকে বলে, 'তুমি ফিরে গিয়ে ছয়টা পুর্যন্ত অপেক্ষা করবে। কনফারেন্স শেষ হলে ডাক্তারবাবুকে নিয়ে আসবে। আর শেষ না হলে আমাদের নিয়ে যাবে।'

কমল অন্তরাকে নিয়ে ফরেষ্ট রেষ্ট হাউসে ঢোকে। বেতের সোফাতে বসেই অন্তরা ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকে। কমল প্রথমটায় থতমত খেয়ে যায়। তারপর কবরীতে পরম মমতায় হাত রেখে বলে, 'ড্রাইভারের সামনে তোমাকে ছোট করার ইচ্ছে আমার ছিলনা। তোমার কথা নীরবে সব শুনব বলেই এখানে নিয়ে এসেছি। সর্বত্র কমান্ডিং পজিশনে থেকেই আমার স্বভাবটা এমন হয়ে গেছে। তুমি না আমার দিদি? কষ্ট দেওয়ার জন্যে ক্ষমা চাইছি।'

'তোমার মত নিষ্ঠুর ও কঠোর মনের মানুষকে কেউ ক্ষমা করবে না।'

'তুমি এখন ছোট ভাইয়ের স্ত্রী। এভাবে বলা কি ঠিক হচ্ছে?'

'আবার কমান্ডিং? তুমি কথা দিয়েছো সব শুনবে।'

'কখন থেকে আমাকে তুমি চিনতে?'

'সে সব কি তুমি ধৈর্য নিয়ে শুনবে? আজও কেন বন্দরের ইশারায় ঢেউ তুলছি? কেন আমার জীবনের প্রথম প্রত্যাশার আগুন দপ করে নিভে গিয়ে তুষের আগুনের মত ধিকি ধিকি করে জ্বলছে? আমি জানি, তুমি জাননা, জানতে চাওনি, সুযোগ এলেও তুমি উৎসাহিত বোধ করোনি। তোমার নীতি কঠোরতা তোমাকে তোমার আকাঙ্ক্ষিত পথে সঠিকভাবে চালিত করলেও আরেক জীবনে নিয়ে এসেছে গভীর অন্ধকার। তোমাকে আমি আমার হৃদয়ের অঞ্জলি দেওয়া কথাটা বলবার সুযোগ পেলাম না, তোমাকে আমি ভালবাসি।'

'কী বলছো তুমি? যে ছেলে আশ্রমে থাকে, যে ছেলের একটা সম্ভ্রমপূর্ণ কাজ নেই, স্থায়ী আয় নেই, সে ছেলেকে অন্তরা দাশগুপ্তা ভালবাসতে চেয়েছিল, কে বিশ্বাস করবে বল?'

'যে ছেলের কথায় হৃদয়ে শান্তির পরশ লাগে, সান্নিধ্যে সুখের স্বর্গ মনে হত, পুরুষালি তেজ আর ব্যক্তিত্ব ছিল, অর্থ তার সহজলভ্য হলেও অনর্থে সতর্ক ছিল, সাহিত্যে অনুরাগী

ব্রিলিয়ান্ট সে ছেলেকে অন্তরা দাশগুপ্তা ভালবেসে জীবন যৌবন সমর্পণ করে সুখী হতে চেয়েছিল বললে সবাই বিশ্বাস করবে।'

'অন্তরা!'

'ইচ্ছে করেই তোমাকে নাম ধরে ডেকেছি। তোমাকে দিদি ডাকতে বাধ্য করেছি। যাতে তুমি আন্তরিকভাবে মেলামেশায় ভরসা পাও। স্বপন ভদ্রের কাছে তোমার প্রকৃতি আচার-আচরণ যা শুনেছি আর যেভাবে সাধনা শুরু করেছিলাম ভগবানকে পাওয়া সহজ ছিল, কিন্তু তোমার ধারে কাছে যেতে পারিনি।'

'সাধনা না ছলনা?'

'ছলনা এখন করছি তোমাকে একটু দেখার জন্যে, একটু কথা বলার জন্যে।'

'তখন বললে না কেন সোজাসুজি?'

'সে কি আর করিনি? দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর তোমার সঙ্গে দেখা করতে গেলেই তুমি ভদ্রকে পাঠিয়ে দিয়ে অন্যত্র চলে যেতে। ভদ্রকে ধমক দিয়ে তোমাকে পাঠাতে বললে মাথায় হাত দিত ভয়ে। ভদ্রের অনুপস্থিতিতে গিয়ে দেখেছি তোমার বৌদি, মেজদি অথবা মাসীমণি তোমাকে আগলে রেখেছে। তুমি তাদের সঙ্গে মধুর হাসিতে কথা বলছো, ঈর্ষায় আমার সমস্ত শরীর জ্বলতো।'

'গিয়ে শাসন করলেই পারতে!'

'তোমাকে? খোঁজ নিয়ে জেনেছি সবাই তোমাকে ভয় করে!'

'এত বদমেজাজি ছেলেকে আবার ভালবাসা কেন?'

'কী জানি? মেয়েরা ঝাল-টক পছন্দ করে বলেই হয়তো।'

'ভালবাসার দৌড় শেষ হয়ে গেল ভয়ে?'

'সে আর বলো না। বলতে বুকটা আমার ফেটে যাচ্ছে। ওফ্, তুমি আমার সব শেষ করে দিলে। বৌদির বাড়িতে গেছি তোমার খোঁজ করতে। বৌদি নেই। টেবিলে পড়ে আছে তোমার বিয়ের চিঠি। আমি যে পাগল হয়ে যাইনি, সেটাই আশ্চর্য। আমার চোখের জল বিন্দু বিন্দু পাথর হয়ে চোখের প্রান্তে জমে গেছে। আমার জীবনে রয়ে গেল শুধু হতাশা।'

'তারপর এখানে এসে হঠাৎ দেখা হয়ে গেল?'

'হঠাৎ কেন হবে? তোমার সঙ্গে দেখা করবার জন্যেই আমি ছলনা করে ওকে নিয়ে এসেছি। একদিন রবিবারের কাগজে প্রকাশিত একটা গল্প সে বারবার পড়ছে দেখে আমিও পড়ছি। সে হঠাৎ বলল, 'গল্পকার আমার দাদা।' তোমার নামটা দেখে আমি চমকে উঠলাম। এতক্ষণ লক্ষ্য করিনি। তুমি সুমনাকে নিয়ে গল্পটা লিখেছ। আমার ঘুমন্ত সিংহটা আহত হয়ে জেগে ওঠে। তোমাকে না পাওয়ার আক্রোশে আমার মনে হয়েছিল, এই বিশ্ব সংসার ধ্বংস হয়ে গেলেই ভাল হত। ওই যে যোগালি মেয়েটি দশটি

ইট মাথায় নিয়ে কাজ করে, তার ভালবাসার পুরুষটিকে সেবাযত্ন করছে, সে আমার চাইতে অনেক সুখী। কেন এমন হল আমার জীবন তুমিই বল? অন্যের চাইতে অনেক বেশি থেকেও আমি বঞ্চিত, আশাহত, মর্মাহত। তুমি সাধারণ মেয়ে সুমনাকে নিয়ে অত সুন্দর গল্প লিখতে পার? আমাকে নিয়ে তোমার লেখনি নীরব-নিথর কেন? আমি কি তোমার কাছে অতটাই দীন-হীন? সেই দিনগুলিতে আমার কুমারী হৃদয়কে কেন্দ্র করে বহু সক্ষম প্রতিষ্ঠিত পুরুষ ঘুরছিল। আর আমি? আমার মন ঘুরছিল তোমাকে কেন্দ্র করে। আমার মন-প্রাণ-হৃদয় জুড়ে শুধু তুমি। তুমিই আমার প্রাণভ্রমর। তীব্র আক্রোশে আমি নিষ্পাপ লোকটির মনে প্রশ্নবোধক চিহ্ন সৃষ্টি করে পড়ে গেলাম মাটিতে।'

'আমি শুনছি, অন্তরা।'

'সে জুনিয়র ডক্টর এসোসিয়েশনের নেতা। আমাদের বাড়িতে আলোচনা হচ্ছিল তাদের স্টেট কনফারেন্স নিয়ে। আমি ওদের সামনে গিয়ে বললাম, এবার স্টেট কনফারেন্স যেন বিলোনীয়াতে হয়। ওরা জানতে চেয়েছিল এতে আমার কী লাভ? আমি বললাম, আমি তৃষ্ণা অভয়ারণ্য দেখতে যাব। ওরা হেসে উঠে মেনে নিয়েছে। আসলে তোমাকে দেখে তৃষ্ণা মেটানোই আমার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল। তোমার ভাষায় আমার ছলনা। আশায় বুক বেঁধে তোমার সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম। তোমার পায়ে হাত দিলাম। না, তুমি চিনতে পেরেও চিনতে চাওনি। একটি কথাও আমার সঙ্গে বললে না। তোমার এত অহংকার? তুমি এত উঁচুস্তরের মানুষ হয়ে গেছ? তুমি এত অসামাজিক? তোমার একটা পবিত্র মূর্তি আমার হৃদয়ের অন্তঃস্থলে প্রতিষ্ঠিত ছিল স্থায়ীভাবে। তার ভিতটা কেঁপে উঠল। হ্যাঁ, আমি ছলনা করেই আজ তোমাকে এখানে নিয়ে এসেছি, একটা চরম শিক্ষা দেবার জন্যে। তোমাকে সমঝাতে যে, নিজের সম্পর্কে অমন আকাশ-ছোঁয়া ধারণা তোমাকে আর মানায় না। অবজ্ঞা, উপেক্ষা, অন্যমনস্কতা, কঠোরতা তোমার ডিক্‌সনারি থেকে মুছে ফেলতে চাই।'

ধূসর রঙের মারুতি দূর থেকে ধীরে ধীরে কাছে এল। ড্রাইভার গাড়ি পার্ক করে নেমে তাদের একবার দেখে, একটু দূরে গিয়ে তাদের আগমনের জন্যে অপেক্ষা করছে। পেছনের দরজা খুলে কেউ বেরুল না।

উষ্ণ কয়েক ফোঁটা জল অপ্রত্যাশিতভাবে সন্ধ্যার অন্ধকারে কমলের কপোল বেয়ে মুখোমুখি বসা অন্তরার পায়ে পড়ে গেল। চমকে উঠে বিদ্যুৎগতিতে অন্তরা একই বেতের সোফাতেএসে বসে। কমলের স্বর স্পষ্ট ও অকম্পিত, 'খুনের দায়ে অভিযুক্ত ব্যক্তি আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ পায়, অন্তত অভিযোগটা কী জানতে পারে। আমার শুধু শিক্ষাই হয়নি অন্তরা, শাস্তিও হয়ে গেল।'

ঘটনার আকস্মিকতায় অন্তরার ছুটন্ত ঘোড়া হঠাৎ লাগাম ছাড়া হলেও সহসাই বশে নিয়ে

আসে। পুলকে শিহরণে পাগল হয়ে যায় অন্তরা। ক্ষুদ্র নাটকীয়তায় সে খুঁজে পায় সুখের ঠিকানা। তার জীবন যৌবনের চরম প্রাপ্তি যেন ঘটেছে। সামনে দাঁড়ানো মানুষটি, যার ব্যক্তিত্ব আকাশের মত বিশাল, যার সান্নিধ্য স্বর্গসুখ এনে দেয়, যার শিক্ষা-যোগ্যতা-অভিজ্ঞতা-প্রতিভা সীমাহীন, যার নিষ্কলঙ্ক চরিত্র স্ফটিকের মত স্বচ্ছ, যার পৌরুষ মেয়েদের গর্বের বিষয়, আজ একান্তভাবে তারই হাতের মুঠোয়। এ রহস্য অন্তরা তার অনুভূতিপ্রবণ মন দিয়ে বুঝতে পেরেছে। পরম মমতায়-ভালবাসায়-শ্রদ্ধায় আঁচল জড়ো করে মুছে দেয় তার কপোল।

ইচ্ছে হয়েছিল অনেক কিছু। কিন্তু সংস্কার, ব্যক্তিত্ব ও সম্ভ্রম তার বাধা হয়ে দাঁড়ায়। কমলের গমনোদ্যত শরীরের সামনে গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে অন্তরা মিনতি করে বলে, 'আজ তুমি রাত করে উদয়পুর যেওনা লক্ষ্মীটি। তোমার রান্নার মাসিতো আসবেনা, তুমি দাদার কোয়ার্টারে চলে এসো। এ জীবনে অন্তত একটি বেলা তোমাকে খাওয়াবার সুযোগ আমাকে দাও।'

'আমি তোমার সব কথা শুনতে পারি একটি শর্তে।'

পরম সুখের হিল্লোলে অন্তরার দুচোখ বুজে এল। এ যেন এক অন্য জগৎ, অন্য অনুভূতি। অনেক দূর থেকে বাঁশিতে লোকগীতির মন মাতানো সুর ভেসে আসছে। সব ভাল লাগছে অন্তরার। এক সেকেণ্ডের মধ্যে তার মৃত্যু হলেও আপত্তি নেই। তার সব প্রাপ্তি ঘটে গেছে। এতদিন ভেবেছিল সে দিয়েছে অনেক, পেয়েছে যৎকিঞ্চিৎ। আজ এ মুহূর্তে মনে হচ্ছে তার প্রাপ্তির পাল্লাটাই ভারী। কমলের শর্ত যত কঠোরই হোক, সে হাসিমুখে মেনে নেবে। এ মানুষটাকে আর টেনে নামাবে না সে। যে মূর্তিকে বছরের পর বছর পুজো দিয়ে এসেছে তার অবয়ব সে পাল্টাতে চায়না।

আত্মরক্ষার সব সতর্কতা মজবুত করে অন্তরা দৃঢ়ভাবে জানতে চায়, 'কী সেই শর্ত?'

'আমাদের দুজনের যেন আজই শেষ দেখা হয়। দৈবাৎ দেখা হয়ে গেলে যেন আমরা সংযত থাকি মনে ও আচরণে।'

'ছোট্ট একটা অনুরোধ রাখবে? ওকে তুমি দূরে সরিয়ে দিওনা। সে আত্মভোলা মানুষ। অন্তত টেলিফোনে কথা বলতে চাইলে বঞ্চিত করোনা। আমার ভালবাসায় স্বার্থ থাকলেও ওর শ্রদ্ধা স্বার্থহীন।'

কমল অন্ধকারে সঠিকভাবে অনুমান করতে পারছেনা অন্তরার চোখে জল কিনা। অন্ধকার মানুষকে অনেক লজ্জা ও গ্লানির হাত থেকে বাঁচিয়ে দেয়। সৃষ্টির মহিমা! কিছুই ফেলনা নয়।

নিজেকে সামলে নিয়ে অন্তরা নিচের দিকে তাকিয়ে ফিসফিস করে কমলকে জিজ্ঞাসা করে, 'আমি কি তোমার হাতটা একটু ধরতে পারব? তোমার হাঁটুতে মাথা রাখতে পারব?'

'এতে বিশ্ব সংসারে কারো অসুবিধা হবেনা হয়তো। কিন্তু দাগটা গভীর হলে ভরাট হয়না। ভরাট হলেও সময় অনেক বেশি লাগে।'

গাড়ির ভেতরটা অন্ধকার। রাজপথেও আলোর ব্যবস্থা নেই। অন্ধকার কেটে দ্রুত ধাবমান ধূসর রঙের মারুতি। কমলের ভেতরে অনুভূত হয়, অন্তরার দুচোখ বেয়ে টপটপ গড়িয়ে পড়ছে ফোঁটা ফোঁটা উষ্ণ জল। সেই অন্ধকারে কমলের হাতটা উঠে অন্তরার পিঠের একটু ওপর স্থির হয়ে দিক পরিবর্তন করে আবার নিজের কাছে ফিরে আসে। অন্ধকার হলেও যা অন্তরার দৃষ্টি এড়ায়নি।